রুথ ক্রোমার ওয়ের

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস

মূল : রুথ ক্রোমার ওয়ের

রূপান্তর : এনায়েত রসুল

.....

ইউরোপ থেকে পশ্চিমমুখী রওনা হয়ে
প্রাচ্যে পৌঁছার একটি পথ আবিষ্কারের
চেষ্টা করতে গিয়ে, অনেকটা
ভুলক্রমেই যেন আমেরিকা আবিষ্কার
করে ফেলেছিলেন কলাম্বাস, এবং
ফলে তিনি যা ভাবতেও পারেননি
বিশ্ব ইতিহাসের ওপর তার চেয়ে
অনেক বেশি প্রভাব রেখে গিয়েছেন
তিনি। নতুন দেশ আবিষ্কার
অভিযানের ও নয়া বিশ্বে উপনিবেশ
স্থাপনের সূচনাকারী তাঁর এই
আবিষ্কার এক বিশেষ ক্রান্তিকালে
ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো।

.....

বাঙলায়ন

ISBN 984 70085 0005 4

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস :: রুথ ক্রোমার ওয়ের। প্রকাশক : বাঙলায়ন, ৬৯ প্যারিদাস রোড, বাঙলাবাজার ঢাকা-১১০০ হতে অস্ট্রিক আর্যু কর্তৃক প্রকাশিত ও শফিক মনজু কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদ : অস্ট্রিক আর্যু। অলঙ্করণ : হেনরি সি. পিৎজ। বর্ণবিন্যাস : টোটেম একাডেমী। প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৪১১, ফেব্রুয়ারি ২০০৪। তৃতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৯, জুন ২০১২।

Cristopher Columbus by Ruth Cromer Weir. Published by Austrik Aarzu & Printed by Shafik Monzu on behalf of BANGLAYAN, 69 Pyaridas Road, Banglabazar, Dhaka 1100. Compose : Totem Academy. Date of Publication : Falgoon 1411, February 2004. Third Print : Ashar 1419, June 2012.

t. (8802)7444287, c. 01197143570
e-mail : banglayan@gmail.com

মূল্য : ৫০ টাকা। Price Tk. 50 ∈l

উ ৎ স র্গ

আজমাইন,
কলাম্বাসের মতো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক তোমার কীর্তি
যুগ যুগ ধরে তোমার নাম আনন্দধারা বইয়ে দিক
আমাদের মাঝে।

ছোট ভাইয়া

সমুদ্রের হাতছানি

ইটালির ছোট্ট শহর জেনোয়া। ছোট হলেও সারা পৃথিবীতে সেই শহরটি বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর হিসেবে–আর পরিচিত তাঁত শিল্পের জন্যে। সেই শহরের একটি ছেলে। কতোই বা বয়স হবে ওর? বড়ো জোর ন' কি দশ। এরই মধ্যে সমুদ্রের সাথে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ছেলেটির।

প্রায় প্রতিদিনই দেশ-বিদেশ হাতে নানা রকম মাল বোঝাই আর যাত্রীবাহী জাহাজ এসে নোঙর করে জেনোয়া বন্দরে। জেনোয়ার সেই ছোট্ট ছেলেটি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সে সব জাহাজের দিকে। জাহাজের লাল-নীল পাল, নাবিকদের কর্মব্যস্ততা আর যাত্রীদের ওঠা-নামার দৃশ্য নিত্য-নতুন মনে হয় তার কাছে। চোখ বড়ো করে সে তাকিয়ে থাকে জাহাজগুলোর দিকে। ওগুলো দেখে দেখে যেনো তার আশ মেটে না!

একদিন ছেলেটি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো একটি জাহাজের দিকে। নাবিক আর কুলিরা মাল বোঝাই করছিলো সেই জাহাজটিতে। তাই দেখছিলো ছেলেটি। আর এমনই তন্ময় হয়ে দেখছিলো যে, সে যে কুলিদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে–এ ব্যাপারটি বুঝতেই পারেনি সে।

একজন নাবিক জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে তদারক করছিলো মাল ওঠানো-নামানোর কাজ। হঠাৎ তার চোখ পড়লো ছেলেটির ওপর। অমনি রাগে খেঁকিয়ে উঠলো সে–এ্যাই! এ্যাই ছোকরা! কি ব্যাপার? পথ আগলে দাঁড়িয়েছো যে? ভাগো, ভাগো এখান থেকে।

ছেলেটি একটু সরে দাঁড়ালো মাতাব্বর গোছের সেই নাবিকের ধমক খেয়ে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলো না নাবিকটি। সে বললো, পথ ছেড়ে দাঁড়াও না বাপু! দেখতে পাচ্ছো না জাহাজে মাল তোলা হচ্ছে? জীবনে কখনো জাহাজ দেখোনি নাকি?

এবার ছেলেটির একটু রাগই হলো নাবিকটির ওপর। সে বললো, জাহাজ দেখবো না কেনো? কতো জাহাজ দেখেছি এ জীবনে! তোমাদের এ জাহাজের চেয়েও বড়ো জাহাজ দেখেছি।

CHINA

নাবিক বললো, তাই নাকি? তাহলে হাড়গিলের মতো এ জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছো কেনো? ভাগো, ভাগো এখান থেকে। নইলে ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দেবো বলছি।

জাহাজের ক্যাপটেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে মালপত্রের একটা তালিকা তৈরি করছিলেন। হৈচৈ শুনে তিনি বললেন, কি হলো রবার্টো ? ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেনো? গোলমাল কিসের?

রবার্টো নামের সেই নাবিকটি বললো, ব্যাপার তেমন কিছু নয় ক্যাপটেন। আমিই সামলাতে পারবো।

ক্যাপটেন বললেন, ভালো কথা। কিন্তু হয়েছে কি খুলে বলবে তো!

রবার্টো বললো, একটা ছেলে সেই সকাল থেকে জ্বালাতন করে মারছে। হারগিলের মতো গলা বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে জাহাজের ভেতর।

ঃ তাতে তোমার সমস্যাটা কোথায়?

ঃ সমস্যা এই যে, মাল ওঠাতে গিয়ে কুলিদের একটু অসুবিধে হচ্ছে। বারবার সরে দাঁড়াতে বলছি– সে সরছে না। আরো অবাক কান্ড স্যার, ছেলেটার পায়ের ওপর দিয়ে পিপে গড়িয়ে গিয়েছিলো। তবুও সরে দাঁড়ায়নি সে।

ঃ তাহলে তো মনে হচ্ছে জাহাজের প্রতি ছেলেটির প্রবল আকর্ষণ আছে, কি বলো রবার্টো?

বললেন ক্যাপটেন। রবার্টো বললো, হবে হয়তো। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, আমাদের জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়লেই কোথা থেকে চলে আসে ছেলেটি। এটা আমি ক'বছর ধরেই লক্ষ্য করছি।

ক্যাপটেন বললেন, তাই নাকি ? তাহলে এক কাজ করো। ওকে ডেকে আনো আমার কাছে। একটু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে দেখি আসল ব্যাপরটি কি ?

ডেকে আনতে বলা হলেও এক রকম টেনে হেঁচড়েই ছেলেটিকে ক্যাপটেনের সামনে হাজির করলো রবার্টো। ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করলেন–কি নাম তোমার?

ছেলেটি বললো, কলাম্বাস– ক্রিস্টোফার কলাম্বাস।

কলাম্বাসের নীলাভ উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেনো ভাবলেন এক মুহূর্ত ক্যাপটেন। তারপর বললেন, তুমি নাকি রোজ রোজ বন্দরে ঘুরে বেড়াও ?

ঃ হ্যাঁ। সময় পেলেই চলে আসি এখানে।

ঃ কেনো ?

ঃ জাহাজ দেখতে খুব ভালো লাগে আমার।

ঃ শুনে খুশি হলাম। তুমি কি আমার জাহাজটা ঘুরেফিরে দেখতে চাও ?

কলাম্বাসের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন। কলাম্বাস তো অবাক। এমন লোভনীয় প্রস্তাব দেবেন ক্যাপটেন, এ তো স্বপ্নেরও অতীত। অথচ দিব্বি প্রস্তাব দিচ্ছেন তিনি!

কলাম্বাস আনন্দে কেমন বিভোর হয়ে গেলো। কি বলবে, কি বলা উচিত ভেবেই পেলো না সে। কিন্তু ক্যাপটেনের তো সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। তাই তিনি তাড়া দিয়ে বললেন, জাহাজ দেখতে চাইলে কোনো আপত্তি নেই আমার। ইচ্ছে মতো ঘুরেফিরে দেখতে পারো এ জাহাজটা। তবে কাজের সময় কাউকে বিরক্ত করবে না। কারো পথ আগলে দাঁড়াবে না। ঠিক আছে ?

এ ছিলো কলাম্বাসের জন্যে এক সুবর্ণ সুযোগ। আর তাই এক দৌঁড়ে কলাম্বাস চলে গেলো জাহাজের ডেকে। সেখানে কাজ করছিলো কয়েকজন ডেকবয়। ঘষে ঘষে পাটাতন পরিষ্কার করছিলো ওরা। কলাম্বাস খুব আগ্রহ নিয়ে দেখলো ওদের কাজ।

মাথার ওপর পতপত করে ওড়ছে সাদা পাল। স্রোতের টানে সমুদ্রে ভেসে যেতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে জাহাজ নোঙরের দড়িতে। জাহাজ কেঁপে কেঁপে উঠছে থরথর করে। এই সাধারণ ব্যাপারগুলোও চমকে দেয় কলাম্বাসকে। সে ভাবে, আহ! কি চমৎকার জীবন জাহাজীদের। কতো ঝকঝকে তকতকে পাটাতনের ওপর চলফেরা করে ওরা ! কতো দেশ ঘুরে বেড়ায় অনবরত। এরচে মজার আর কি হতে পারে?

ওপরের ডেক দেখা শেষ হলে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের ভেতর নেমে গেলো কলাম্বাস। সেখানে সাজানো হচ্ছে হাজারো রকম মালামাল। রেশমের গাঁইট, মদের পিপে, কাপড়ের থান, তুলোর গাঁইট, যন্ত্রপাতি ভর্তি বাক্স, নানা ধরনের গরম মশলা– আরো কতো কি! কলাম্বাস শুনেছে, এসব মশলা এসেছে দূরপ্রাচ্যের এমন সব দ্বীপ থেকে, যাকে বলা হয় ইন্ডিজ। চা এসেছে চীন আর ভারত থেকে। তার মানে, এ জাহাজ গিয়েছিলো সে সব দেশে। এ জাহাজের নাবিকদের সৌভাগ্য হয়েছে সে সব দেশের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করার–কথা বলার। কি যে মজার নাবিক জীবন!

কলাম্বাস জাহাজের এক খোপ থেকে অন্য খোপে ঘুরে বেড়ালো। বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়লো সে। নিজেকে হারিয়ে ফেললো কল্পনার জগতে। এভাবে কেটে গেলো অনেকটা সময়। কতোটা সময়, কলাম্বাস তা জানে না।

হঠাৎ কলাম্বাস শুনতে পেলো এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠ– পালগুলো তুলে দাও। এক্ষুনি জাহাজ ছাড়তে হবে। তোমরা তৈরি হয়ে যাও .....।

আবার ভেসে এলো অচেনা আরেকটি কণ্ঠ– আরে আরে, সেই ছেলেটি গেলো কোথায় ? খুঁজে বের করো ওকে। জলদি ওকে নামিয়ে দাও। জাহাজ এখনই বন্দর ছাড়বে।

কলাম্বাস তো সবই শুনতে পেয়েছিলো। তাই আর দেরি না করে সে উঠে এলো ওপরের ডেকে। কলাম্বাসকে দেখতে পেয়েই এক নাবিক তাকে নামিয়ে

দিলো বন্দরে–নামিয়ে দেয়া নয়, রীতিমতো ছুড়ে ফেলে দেয়া হলো তাকে! কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই কলাম্বাসের। মুগ্ধ চোখে সে তাকিয়ে রইলো জাহাজটির দিকে।

ততোক্ষণে জাহাজের সবগুলো নোঙর তোলা হয়ে গেছে। সর্বশেষে পালটিও টানটান হয়ে ফুলে উঠেছে। ধীরে ধীরে জাহাজ সরে যাচ্ছে বন্দর থেকে।

কলাম্বাস এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে জাহাজের বন্দর ছেড়ে চলে যাবার দৃশ্য! দেখতে দেখতে জাহাজটি সমুদ্রের বুক চিরে চলে গেলো দূরে..... আরো দূরে। এক সময় কলাম্বাস দেখতে পেলো শুধু জাহাজের মাস্তুলগুলো। কিছুক্ষণ পর সেগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কলাম্বাস ভাবলো, কেউ কেউ বলে পৃথিবীটা গোল। বলের মতো পৃথিবীর আকৃতি। সত্যিই কি তাই ? ইস্, যদি নিজ চোখে যাচাই করে দেখা যেতো!

এ ধরনের হাজারো কথা ভাবতে ভাবতে কেটে গেলো অনেকটা সময়। হঠাৎ সে শুনতে পেলো একটি ডাক–কলম্বো!

কলাম্বাসকে আদর করে তার বাবা-মা আর ভাইবোনেরা ডাকে কলম্বো। সেই ডাক শুনে বাস্তবে ফিরে এলো কলাম্বাস। ঘুরে তাকালো সে। অমনি দেখতে পেলো ছোট ভাইকে। বারথলমিউ নাম এ ভাইটির। কলাম্বাস ভীষণ স্নেহ করে ওকে।

বারথলমিউ বললো, কি যে মুসকিল তোমাকে নিয়ে! সেই ভোর থেকে জাহাজঘাটে ঘুরঘুর করছো। ওদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুরও পেরিয়ে যাচ্ছে। রান্না শেষ হয়ে গেছে সেই কখন! চলো, খেতে চলো। মা ডাকছেন।

খিদে ঠিকই পেয়েছিলো কলাম্বাসের। কিন্তু সমুদ্রের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে বলে মনটা খারাপ হয়ে গেলো ওর। ছোট ভাইয়ের পিছুপিছু সে এগোতে লাগলো বাড়ির পথে।

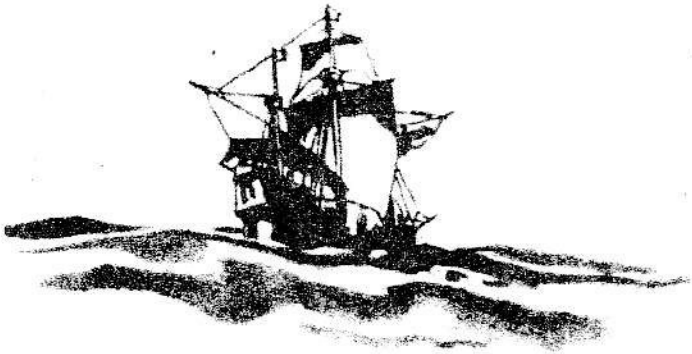

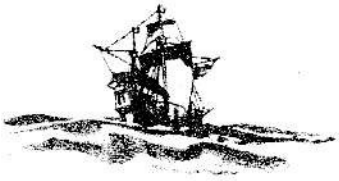

ছেলেবেলার দিনগুলো

এসব তো আজ থেকে ছয়শো বছর আগের কথা। সে সময় জেনোয়ার পথঘাট আজকের মতো এমন ঝকঝকে তকতকে ছিলো না। পথঘাট ছিলো আঁকাবাঁকা, উঁচু নিচু আর জল-কাদায় একাকার। সেই পথের পাশেই মানুষ শূকর পালতো, ভেড়া ছাগল গরু ষাঁড় বেঁধে রেখে দিতো। এসবের পাশ কাটিয়ে কলাম্বাস আর বারথলমিউ ফিরে এলো বাড়ি।

এতোক্ষণ কলাম্বাস ছিলো বিশাল সমুদ্রের তীরে। দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসা মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিয়েছিলো সে। কিন্তু বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকতেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো ওর। একটা বোদকা গন্ধ নাকে-মুখে এসে লাগলো কলাম্বাসের। এ গন্ধটার সাথে জন্মের পর থেকেই পরিচিত সে। এটা ছিলো রেশম সুতোর গন্ধ। এ গন্ধ কখনো ভালো লাগতো না কলাম্বাসের। সব সময় সে ভাবতো, উহ্! কবে যে মুক্ত সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে পারবো। তাহলে আর বিরক্তিকর এ গন্ধ শুঁকে বেড়াতে হবে না।

কলাম্বাসরা যে শহরে থাকতো সে শহরটি প্রসিদ্ধ ছিলো তাঁত শিল্পের জন্যে। প্রায় প্রতিটি পরিবারই কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলো এ শিল্পের সাথে। কলাম্বাসের বাবা জেমেনিকো কলাম্বাস আর মা সুসানিও তাঁতির কাজ করতেন। তাদেরকে সহযোগিতা করতো কলাম্বাস, বারথলমিউ আর ভায়েগো। রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে সংসার চালাতে হতো তাদের। কিন্তু কলাম্বাসের ভালো লাগতো না এ কাজ। সে ভাবেতো, না না। এ কাজ আমার জন্যে নয়। অন্য কিছু করতে হবে আমাকে। সম্ভব হলে জাহাজে চাকরি নিয়ে চলে যাবো আমি অজানা দেশের সন্ধানে।

আজ ঘরে ঢুকেই রেশম সুতোর গন্ধটা একটু বেশিই খারাপ লাগলো কলাম্বাসের। ছোট্ট ঘর–ছোট্ট জানালা। আলো আসে না ঘরের ভেতর, বাতাস ঢোকে না। কিছুই প্রায় দেখা যায় না। এমন ঘরে মানুষ থাকতে পারে?

মনে মনে ভাবে কলাম্বাস। এমন ছোট্ট ঘরে বসে ভেড়ার পশম খুঁটেই কি সে জীবনটা কাটাবে? কি করে মেনে নেবে সে? না-না-না- কিছুতেই না। মুক্তির পথ খুঁজে পেতেই হবে তাকে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেলে জেমেনিকো কলাম্বাসকে ডেকে তার হাতে তুলে দিলেন কয়েকটি পয়সা। বললেন, এগুলো তোমার। ইচ্ছে মতো খরচ করবে। এজন্যে কোনো হিসেব দিতে হবে না তোমাকে।

বাবার কথা শুনে কলাম্বাস তো অবাক। ব্যাপার কি? বাবা হঠাৎ আজ এতো সদয় হলেন কেনো ওর ওপর? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে।

কারণটাও বাবাই বললেন কলাম্বাসকে। বললেন, তৈরি হয়ে নাও কলাম্বো। আমাদের এক্ষুনি গির্জায় যেতে হবে। আজ সেন্ট ক্রিস্টোফারের জন্মদিন।

এবার ঝরঝর করে সব মনে পড়ে গেলো কলাম্বাসের। সেন্ট ক্রিস্টোফারের জন্মদিন ছিলো ২৫ জুন। সেই একই দিনে ১৪৫১ সালে জন্ম হয়েছিলো কলাম্বাসেরও। তাই তো অনেক আশা করে বাবা তার নাম রেখেছেন ক্রিস্টোফার কলাম্বাস। মনে মনে ইচ্ছে, কলাম্বাসও একদিন মহাপুরুষ ক্রিস্টোফারের মতো বিখ্যাত হয়ে উঠবে। বিশ্ব জুড়ে নাম হবে তার।

সেন্ট ক্রিস্টোফার প্রকৃত পক্ষেই ছিলেন মহাপুরুষ। মানুষের জন্যে দয়ার অন্ত ছিলো না তাঁর। যখন যুবক ছিলেন তখন নদী পারাপারে মানুষকে সাহায্য করতেন তিনি। তাদের মালপত্র নিজের কাঁধে করে পৌঁছে দিতেন নদীর অপর পারে।

একদিনের ঘটনা। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। নদীর তীরে বসে আছেন সেন্ট ক্রিস্টোফার। এমন সময় একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়ালো সেখানে। কাঁধে তার একটি থলে ঝোলানো। ক্রিস্টোফারের সামনে এসে ছেলেটি বললো, আমাকে একটু নদী পেরোতে সাহায্য করবে ভাই?

সেন্ট ক্রিস্টোফার বললেন, নিশ্চয়ই। সে জন্যেই তো বসে আছি আমি। দাও ভাই, তোমার থলেটা আমাকে দাও।

থলেটি কাঁধে নিয়ে অবাক হলেন সেন্ট ক্রিস্টোফার। তাঁর মনে হলো থলেটা যেনো ধীরে ধীরে ওজনে বেড়েই যাচ্ছে-বেড়েই যাচ্ছে! এমন হচ্ছে কেনো?

অনেক কষ্ট করে নদী পার করলেন সেন্ট ক্রিস্টোফার। পরে জানতে পারলেন আসল রহস্য। যীশু খ্রিস্টই ছোট ছেলের রূপ ধরে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন সেন্ট ক্রিস্টোফারকে। সেই পরীক্ষায় জয়ীও হয়েছিলেন তিনি। মহান ব্যক্তি হিসেবে যে ক্রিস্টোফারকে সবাই জানে, জেমেনিকো চেয়েছিলেন কলাম্বাসকেও তেমনি সবাই জানবে। এক নামে চিনবে। পরবর্তীকালে জেমেনিকোর এ সাধ পূরণ হয়েছিলো। সে অনেক পরের কথা।

সে যুগে আজকের মতো ঘরে বসে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে জন্মদিন পালন করা হতো না–জন্মদিন পালন করা হতো গির্জায় গিয়ে। তাই জেমেনিকো সবাইকে নিয়ে গেলেন স্থানীয় গির্জায়। সেখানে প্রার্থনা করা হলো কলাম্বাসের উজ্জ্বল

ভবিষ্যৎ আর সমৃদ্ধির জন্যে। পাদরি শোনালেন সেন্ট ক্রিস্টোফারের জীবন থেকে চমৎকার সব গল্প। তিনি বললেন, মানুষ মানুষের জন্যে জন্মগ্রহণ করে। পরের উপকার করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। মানুষের উচিত সত্য ও সুন্দরের কথা সবার মাঝে প্রচার করে বেড়ানো।

কলাম্বাস ভাবলো, আমার নাম রাখা হয়েছে মহাপুরুষ ক্রিস্টোফারের নামে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো তাঁর মতো মহান হতে। যেখানে যাবো সেখানেই যীশুর বাণী প্রচার করবো।

এ ঘটনার পর থেকে গির্জার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেলো কলাম্বাসের। সে সময় পেলেই চলে যেতো গির্জার চত্বরে। পাদরি সাহেবের কাছে শুনতো ধর্মের কথা। এই পাদরি সাহেবের কাছেই কলাম্বাস প্রথম দেখতে পেয়েছিলো ছাপানো বই। সেটি ছিলো বাইবেলের একটি মুদ্রিত কপি। কলাম্বাস মুগ্ধ হয়েছিলো ছাপানো বইয়ের ঝকঝকে সুন্দর অক্ষর দেখে।

কলাম্বাসকে সব সময়ই তাঁর বাবা-মাকে তাঁতের কাজে সাহায্য করতে হতো। এর মাঝে যেটুকু সময় পেতো, সে চলে যেতো বন্দরে। সেখানে গিয়ে গল্পে মেতে উঠতো নাবিকদের সাথে। শুনতো দেশ-বিদেশের কথা। সমুদ্রের বুকে ঝড়ের সাথে বীরের মতো যুদ্ধ করে অচেনা দ্বীপ আর সোনা-রুপোর দেশে চলে যাবার কথা।

সে সময় পর্তুগিজ নাবিকরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিলো দূরপ্রাচ্যে যাবার নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার জন্যে। কারণ তখনো সংক্ষিপ্ত ও নিরাপদ সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে দূরপ্রাচ্যের দেশ থেকে নীল, মশলা, চা, রেশম ও অন্যান্য পণ্য ইউরোপে নিয়ে যেতে খুবই কষ্ট করতে হতো। পথেই লেগে যেতো বছরের পর বছর। তারপর ঝড় আর জলদস্যুদের বিপদ তো ছিলোই।

কলাম্বাস যখন ছোট সে সময় দূরপ্রাচ্যের দেশ থেকে মালামাল আনতে হলে প্রথম তা চাপানো হতো উটের পিঠে। উট, খচ্চর, গাধা আর ঘোড়া ছিলো প্রধান বাহন। সে সবের পিঠে চাপিয়ে মালামাল নিয়ে আসা হতো মাইলের পর মাইল। কয়েক মাস সময় লেগে যেতো তাতে। পথে অনেক পণ্যই নষ্ট হতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। কখনো কখনো ডাকাতরাও দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তো ব্যবসায়ীদের পণ্যবাহী উট ঘোড়া খচ্চরের ওপর। ফলে অনেক আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হতো তাদের। কখনো কখনো ডাকাতদের হাতে জীবনও দিতে হতো কাউকে কাউকে।

এতোসব ঝামেলা আর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মালামাল নিয়ে আসা হতো কনস্ট্যান্টিনোপল বা কাছাকাছি কোনো বন্দরে। সেখানে অপেক্ষমান জাহাজে তোলা হতো সে সব পণ্য সামগ্রী। হেলেদুলে ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে জাহাজ

এগোতে ইউরোপের দিকে। একদিন সে জাহাজ প্রাচ্যের মালামাল নিয়ে পৌঁছে যেতো ভেনিস, জেনোয়া, লিসবন নয়তো অন্য কোনো বন্দরে। মাল খালাস করা হতো সেখানে। এর মাঝে কেটে যেতো বহুদিন। খরচ পড়তো আশঙ্কাজনক ভাবে বেশি। হয়তো জীবনও দিতে হতো অনেক নাবিককে।

সেকালের ক্যাপটেনরা ছিলেন দুঃসাহসী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে কোনো অভিযানে বেরিয়ে পড়তে উৎসাহের অন্ত ছিলো না তাদের। তাদের ধারণা ছিলো দূরপ্রাচ্য থেকে সহজ পথে মালামাল আনার উপায় একদিন বের হবেই হবে। আর তা যদি হয় তবে দেশ-বিদেশের সাথে যোগাযোগ বেড়ে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। প্রয়োজনে সে সব দেশে উপনিবেশও গড়ে তোলা যাবে।

কলাম্বাস ছেলেবেলা থেকেই এসব কথা জানতো। নানা দেশের নাবিকরা এসে গল্প করতো বন্দরে। কলাম্বাস তাদের সাথে ভাব জমিয়ে শুনতো সে সব কথা। সেই বয়সেই সে শুনেছিলো, ইউরোপের পশ্চিমে আরো একটি মহাসমুদ্র আছে। ওটার নাম আটলান্টিক। পর্তুগিজ নাবিকরা সেই মহাসমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার সময় মেডিয়েরা আর আজোরাস দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিলো। কিন্তু তারও পশ্চিমে অন্য কোনো সমুদ্র, মহাসমুদ্র বা দেশ আছে কিনা–কেউ জানে না তা।

সে সময় নাবিকরা শুধু জানতো পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর ছাড়া আর কিছু নেই। সেই মহাসাগরের পাহাড়ের মতো উঁচু ঢেউগুলো ঝড়ের সময় আছড়ে পড়ে ইউরোপের প্রস্তরময় দ্বীপে।

কেউ কেউ জাহাজ নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যেতে চেয়েছিলো অন্য কোথাও। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। কি হয়েছে তাদের কেউ তা জানে না। তারা অন্য কোনো দেশে গিয়ে থেকেও যেতে পারে–আবার সমুদ্রে ডুবে মরেও যেতে পারে। তবে দু'একজন ক্যাপটেন মাঝ সমুদ্র থেকে ফিরে এসে জানিয়ে ছিলেন কাল্পনিক গল্প। তারা বলেছিলেন, আটলান্টিকের শেষ নেই। মানে আটলান্টিকই পৃথিবীর শেষ সীমা। ওদিকে এগোনো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বেশি দূর এগোলে হয়তো পৃথিবীর বাইরেই ছিটকে পড়বে তারা!

বালক কলাম্বাস কিন্তু মন থেকে বিশ্বাস করতে চাইতো না এসব কথা। সে ভাবতো, পৃথিবী যদি বলের মতো গোলাকারই হবে, তবে এর তো শেষ থাকার কথা নয়! নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে নাবিক আর বিজ্ঞানীদের। বড়ো হয়ে সে নিজেই চেষ্টা করবে এ রহস্য ভাঙার। দেখবে সত্যি সত্যিই কি আছে আটলান্টিকের ওপারে।

সমুদ্রের ডাক শোনার জন্যে মন অস্থির হয়ে উঠেছিলো কলাম্বাসের। আর এজন্য প্রতিদিন দুবেলা ছুটে যেতো সে বন্দরে। চেষ্টা করতো কোনো না কোনো

একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে জাহাজে ভেসে বেড়াতে। কিন্তু ছোট ছিলো বলে কেউই কাজে নিতে রাজি হতো না তাকে। কারণ নাবিকদের জীবন অনেক কঠোর। অনেক কাজ করতে হয় তাদের। কঠিন কঠিন কাজ। কলাম্বাসের মতো ছোট ছেলে তা পারবে কেনো? কিন্তু কথায় বলে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কলাম্বাসের বেলাও হালো তাই। একদিন এক জাহাজে ডেকবয় হিসেবে চাকরি পেয়ে গেলো সে। সেটা ১৪৬৫ সালের কথা। কলাম্বাসের তখন বয়স ছিলো চৌদ্দ।

শেষ জীবনে কলাম্বাস তাঁর প্রথম সমুদ্র যাত্রা সম্পর্কে লিখেছিলেন-আমি চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম সমুদ্র যাত্রা করি। আর এ জন্যে আমাকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। সে ছিলো আমার জন্যে এক অস্থিরতায় ভরা দিন।

চৌদ্দ বছর বয়সে জাহাজে কাজ পাওয়া তো রীতিমতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্যে কলাম্বাস এমনই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর মনে হয়েছিলো এমন একটা সুযোগের জন্যে যুগ যুগ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে!

প্রথম সমুদ্র যাত্রা

সমুদ্রের সাথে কলাম্বাসের ছিলো আজীবন বন্ধুত্ব। জন্মের পর থেকেই সমুদ্রের অসীম নীল পানি দেখেছেন তিনি। শুনেছেন সমুদ্রের গর্জন। দেশ-বিদেশ থেকে পণ্য বোঝাই জাহাজ যখন জেনোয়া বন্দরে এসে ভিড়তো, তখন একাত্ম হয়ে মিশতেন তিনি সেসব নাবিকের সাথে। সেই বালক কলাম্বাস যখন জাহাজে চাকরি পেয়ে গেলেন, তখন তিনি নিজেকে উজাড় করে দিলেন জাহাজে কাজে।

একটানা কয়েক বছর জাহাজে কাজ করলেন কলাম্বাস। এ সময়ের মধ্যে তাঁর ঘোরা হয়ে গেলো গ্রীস, স্পেন, পর্তুগাল আর আফ্রিকা মহাদেশের নানা দেশ। শিখলেন কম্পাস ব্যবহার। মানচিত্র দেখা ও ব্যবহারের নিয়মকানুন জানলেন তিনি। আর শিখলেন সমুদ্রের ঢেউ ও আকাশের রং দেখে কি করে আগেভাগে আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা করা যায়, সে সম্পর্কে। একটা নির্দিষ্ট পথ বেছে নিয়ে সে পথ ধরে জাহাজ পরিচালনার কলাকৌশলও রপ্ত করলেন কলাম্বাস। মোট

কথা, একজন দক্ষ নাবিক হবার জন্যে যে সব জ্ঞান প্রয়োজন, যে দক্ষতা না হলেই নয়– এ ক'বছরে সবই আয়ত্ত করলেন তিনি।

কলাম্বাস ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে তুললেন একজন পাকা নাবিক হিসেবে। ফলে দু'একটা জাহাজের ক্যাপটেন হিসেবে দায়িত্বও পেলেন তিনি। সে সব জাহাজের সফল অভিযানের পর ইটালিতে ছড়িয়ে পড়লো কলাম্বাসের নাম। কলাম্বাসও সততার সাথে কাজ করে যেতে লাগলেন দিনের পর দিন।

যে সময়ের কথা লিখা হচ্ছে, সে সময় নাবিকদের জীবন ছিলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগই নয়, ছিলো দস্যু আর শত্রুপক্ষীয় জাহাজিদের আক্রমণের ভয়। মাঝে মাঝেই পণ্য বোঝাই সওদাগরি জাহাজ আক্রান্ত হতো জলদস্যুদের হাতে। অনেক সময় অন্য দেশের সওদাগরি জাহাজের নাবিকরাও আক্রমণ করে বসতো একে অপরকে। এতে জাহাজের ক্ষতি হতো, জান-মালের ক্ষতি হতো। তবুও সমুদ্রের প্রতি নাবিকদের ছিলো দুর্দান্ত আকর্ষণ। কলাম্বাস এ আকর্ষণ অনুভব করেছেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

জীবনে কতোবার কতো বিপদে পড়েছেন কলাম্বাস তার হিসেব নেই। একবার জেনোয়া শহরের কয়েকটি জাহাজ দল বেঁধে যাচ্ছিলো পর্তুগালের উপকূল ছুঁয়ে। সকালের দিকে তারা খবর পেলো ভেনিসের চারটি জাহাজ এখান দিয়েই দেশে ফিরে যাচ্ছে। ওদের সাথে রয়েছে বহু মূল্যবান পণ্য সামগ্রী।

নৌবহরের প্রধান হুকুম দিলেন সবাইকে লিসবন শহরের কাছাকাছি নদ-নদীতে ওঁৎ পেতে থাকতে। কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না ভেনিসের জাহাজগুলোকে। ওদেরকে আক্রমণ করতে হবে।

ভেনিসের সেই চারটি জাহাজ কাছাকাছি আসতেই জেনোয়ার নাবিকরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো তাদের। আঁকশি ছুড়ে বেঁধে ফেলা হলো জাহাজগুলোকে। কলাম্বাস যে জাহাজের ক্যাপটেন ছিলেন, তার সাথেও বাঁধা হলো একটি জাহাজ। তারপর আরম্ভ হলো লুটপাট।

ভেনিসের জাহাজে যে সব নাবিক ছিলো তারাও ছিলো খুব সাহসী। তারাও জীবন পণ করে বাধা দিলো জেনোয়ার জাহাগুলোকে। ফলে দু দলে বেধে গেলো ভয়ানক যুদ্ধ। চারদিকে শুধু মার মার কাট্ কাট্ শব্দ আর তলোয়ারের ঝনঝনানি। এরই মাঝে একজন ছুটে এসে বললো, সর্বনাশ হয়ে গেছে ক্যাপটেন। আমাদের জাহাজে আগুন লেগেছে। এক্ষুনি আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে।

কলাম্বাস দেখলেন লোকটি ভুল বলেনি। শুধু তাদের জাহাজেই নয়, তাদের সাথে বেঁধে রাখা ভেনিসীয় জাহাজেও আগুন ধরেছে। এ আগুন এতোটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে, শত চেষ্টা করলেও এখন আর তা নেভানো যাবে না। সুতরাং জীবন নিয়ে পালানো ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উপায় নেই।

যেই ভাবা সেই কাজ। সবাইকে সমুদ্রে নেমে পড়তে বললেন কলাম্বাস। তিনি নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমুদ্রে। কিন্তু সমস্যা হলো হাতের কাছে এমন কিছুই খুঁজে পেলেন না, যা ধরে কিছুক্ষণ ভেসে থাকবেন তিনি। দেখতে পেলেন শুধু ঢেউ আর ঢেউ। কাছাকাছি কেউ নেই–কিছু নেই! তাহলে কি সমুদ্রেই ডুবে যাবেন তিনি?

ভাগ্য ভালো ছিলো কলাম্বাসের। হঠাৎই তাঁর চোখে পড়লো একটি লম্বা দাঁড়। ভেনিসীয় জাহাজ থেকে খসে পড়ে ওটা ভেসে যাচ্ছিলো কলাম্বাসের কাছ দিয়ে। তিনি সাঁতরে গিয়ে আঁকড়ে ধরলেন দাঁড়টিকে। ফলে মনে আবার সাহস ফিরে এলো তাঁর। মনে মনে প্রার্থনা করলেন, হে খোদা! আমি যেনো এ যাত্রা বেঁচে যাই। যেনো সাঁতরে কোনো কূলে উঠতে পারি।

আল্লাহ শুনেছিলেন কলাম্বাসের প্রার্থনা। কিছুক্ষণ সাঁতরাবার পরই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন লিসবনের কাছাকাছি এক সাগর সৈকতে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলেন লিসবন শহরে।

নতুন দেশ নতুন জীবন

পর্তুগালের রাজধানী লিসবন। সে সময় সারা বিশ্ব জুড়ে ছিলো লিসবনের নাম। নৌবিদ্যার প্রসারের জন্যে পর্তুগালের রাজা হেনরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক নৌবিদ্যালয়। নানা দেশের নাবিকরা এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো সেখানে। দেশ-বিদেশের সর্বশেষ খবর পাওয়া যেতো সেখানে। এসব কারণে লিসবন শহরটি ভালো লেগে গেলো কলাম্বাসের। তিনি সেখানেই থেকে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

লিসবনে থাকার পেছনে অবশ্য আরেকটি গোপন লক্ষ্যও ছিলো কলাম্বাসের। আর তা হলো সমুদ্র যাত্রার জন্যে সুযোগ খোঁজা।

পর্তুগালের রাজা হেনরি আর তাঁর পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় জন ছিলেন নৌবিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন নতুন নতুন সমুদ্র পথ আর দেশ আবিষ্কার করার জন্যে। একটা জাহাজ লিসবন বন্দর ত্যাগ করলেই মানুষ আশা

করতো এ জাহাজের নাবিকরা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দেশ আবিষ্কার করে তবে ফিরে আসবে। কলাম্বাসও চাইছিলেন তেমন কোনো অভিযানের নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু এখানে তো তাঁকে চেনে না কেউ। কে দেবে এ দায়িত্ব? দেখা যাক চেষ্টা করে।

লিসবন শহরে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিলেন কলাম্বাস। সমুদ্র সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ছিলো তাঁর। সে জ্ঞানের ওপর ভরসা করে কলাম্বাস এঁকে চললেন মানচিত্রের পর মানচিত্র। সে সব মানচিত্র এতোটাই নির্ভুল ছিলো যে, সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপটেনরা তা প্রতিযোগিতা করে লুফে নিতে লাগলেন তাঁর কাছ থেকে। তাতে তাদের সমুদ্র যাত্রা হতে লাগলো আরো নিরাপদ আরো সচ্ছন্দ। ফলে একা একা মানচিত্র এঁকে কুলিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো কলাম্বাসের পক্ষে। তিনি তখন জেনোয়া থেকে ডেকে নিয়ে এলেন ছোটভাই বারথলমিউকে। দু ভাই মিলে ব্যবসা চালাতে লাগলেন মনোযোগ দিয়ে।

কিছুদিন আগে হার্লেম শহরের এক বুড়ো বিজ্ঞানী মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এ বিজ্ঞানীর নাম ছিলো চার্লস গুটেনবার্গ। বইপত্রের জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছিলো গুটেনবার্গের আবিষ্কার। কলাম্বাসও উৎসাহী হয়ে ওঠলেন বইপত্রের ব্যাপারে। মাত্রচিত্র বিক্রির দোকনে বইপত্র বিক্রি করাও শুরু করলেন তিনি। বিশেষ করে ভূগোল আর নৌবিদ্যার বইয়ে ঠাসা থাকতো কলাম্বাসের দোকান। একটি বই বিক্রি করার আগে বারবার ওটা পড়ে নিতেন তিনি।

ছেলেবেলা থেকে সমুদ্রের প্রতি কলাম্বাসের ছিলো যেমন তীব্র আকর্ষণ-ধর্মের প্রতিও ছিলো তেমন টান। সময় পেলেই গির্জায় যেতেন কলাম্বাস। এমনি একদিন গির্জায় গেলে কলাম্বাসের সাথে পরিচয় হলো ফেলিপা পেরেস্টোলো নামে এক যুবতীর। তাঁর বাবা ছিলেন বিখ্যাত এক নাবিক। একটা ভূখন্ডও আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। মানচিত্র আঁকিয়ে হিসেবেও বেশ পরিচয় ছিলো তাঁর। এসব কারণে কলাম্বাসের সাথে ফেলিপা পেরেস্টোলোর গড়ে উঠলো আন্তরিক সম্পর্ক।

অনেক ভেবেচিন্তে ১৪৭৯ সালে ফেলিপাকে বিয়ে করলেন কলাম্বাস। বিয়ের পর কলাম্বাস তাঁর ভাইকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই উঠে গেলেন। এখানে এসে পেলেন শ্বশুর সাহেবের তৈরি করা অনেকগুলো মানচিত্র। সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে একদিন অদ্ভুত এক চিন্তা আসলো কলাম্বাসের মাথায়। তিনি ভাবলেন, ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছবার জন্যে সবাই শুধু দক্ষিণের সমুদ্র পথই বেছে নেয়। কিন্তু তারা তো বেশি দূর যেতে পারে না। কোনো না কোনো দেশে গিয়ে থেমে যায় তাদের অগ্রযাত্রা–আবার নিজ দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয় তারা। কিন্তু মানুষ কেনো নতুন করে ভাবে না ?

নতুন করে ভাবতে গিয়ে কলাম্বাস সিদ্ধান্ত নিলেন, যদি কখনো সুযোগ আসে তবে তিনি ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছার জন্যে উল্টো পথে যাত্রা করবেন। যেহেতু পৃথিবী গোলাকার এবং চীন-জাপান সমুদ্রের তীরে অবস্থিত দুটি দেশ, সেহেতু

উল্টো দিকে জাহাজ ভাসালে কেনো পৌঁছা যাবে না সেখানে? পূর্বের দেশে পৌঁছার জন্যে যাত্রা করবেন পশ্চিমে। আর দক্ষিণের দেশে যাবার জন্যে জাহাজ ভাসাবেন উত্তরে। তারপর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

এসব ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠতেন কলাম্বাস। মানচিত্র আঁকতে আঁকতে নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠতেন– পর্তুগিজ নাবিকরা নিজ থেকে কিছুই ভাবতে জানে না। এরা শুধু জানে দক্ষিণ, শুধুই দক্ষিণ! দক্ষিণ ছাড়া যেনো সব পথ বন্ধ! আর কোনো দিক নেই আল্লাহর এ দুনিয়ায়।

সে যুগে মানচিত্র আঁকা হতো ভ্রমণকারীদের বর্ণনা আর অভিযাত্রীদের বিবরণ থেকে। পশ্চিম দিকে খুব একটা যেতো না কেউ। তাই কলাম্বাসের আঁকা মানচিত্রেও পশ্চিম দিকটা থেকে যেতো ফাঁকা। এটা খুবই কষ্ট দিতো তাঁকে। তাঁর খুব ইচ্ছে হতো পশ্চিম দিকে কিছু একটা বসিয়ে দিতে। কিন্তু না জেনে না শুনে একটা কিছু বসিয়ে দিলেই তো হবে না! এর পেছনে থাকা চাই সত্যের উপস্থিতি। আর দেশ আবিষ্কার না হলে সত্য আসবে কোথা থেকে? সুতরাং পশ্চিম দিকটা ফাঁকাই থেকে যেতো।

কলাম্বাস প্রতিজ্ঞা করলেন, পশ্চিমে কি আছে তা জানতেই হবে তাঁকে।

বিয়ের পর লিসবন ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে কলাম্বাস চলে গেলেন মেডিরাসে। এ দ্বীপটি আবিষ্কার করেছিলেন ফেলিপার বাবা। তিনি ছিলেন রাজা হেনরির অধীনে এক নৌ কর্মকর্তা।

মেডিরাসের পাশ দিয়ে প্রায়ই কাঠের টুকরো, ছনের চালা, গাছের ভাঙ্গা ডালপালা ভেসে যেতে দেখতেন কলাম্বাস। এসব দেখে মনে দৃঢ় ধারণা হলো, পশ্চিমে নিশ্চয়ই আরোও দেশ আছে। নইলে এসব জিনিস ভেসে আসে কোথা থেকে?

একদিন কলাম্বাস তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমি নিশ্চিত পশ্চিম দিকে দেশ আছে। একদিন যদি সেখানে পৌঁছাতে পারি, তবে মণিমুক্তো দিয়ে মুড়িয়ে দেবো তোমাকে।

কলাম্বাস কিন্তু সে সাধ আর মেটাতে পারলেন না। বিয়ের মাত্র দু'বছর পর ১৪৮১ সালে ডায়েগো নামে এক ছেলের জন্ম দিয়ে মারা গেলেন ফেলিপার। কলাম্বাস তখন একেবারেই ভেঙ্গে পড়লেন। মেডিরাস আর ধরে রাখতে পারলো না তাঁকে। ছেলেকে নিয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন লিসবনে। আবার নতুন করে শুরু করলেন মাত্রচিত্র অঙ্কনের ব্যবসা। তবে মন তাঁর অস্থির হয়ে উঠলো অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্যে।

ইটালির ফ্লোরেন্সে টসকানেলি নামে এক বিজ্ঞানী ছিলেন। ভূগোলের নানা বিষয়ে ভালোই জ্ঞান ছিলো তাঁর। কলাম্বাস যোগাযোগ করলেন টসকানেলির

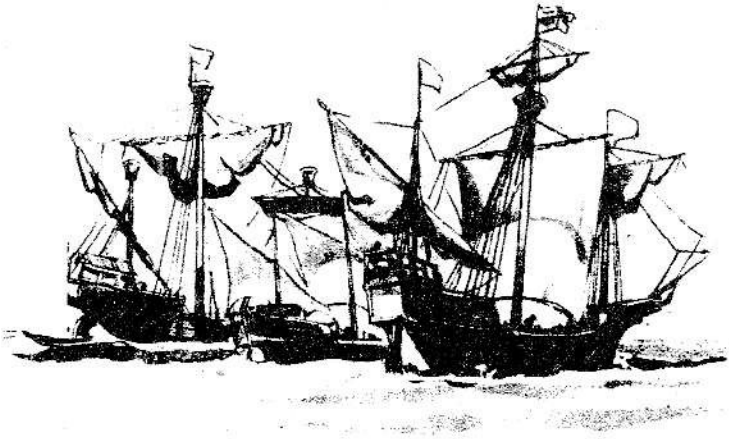

সাথে। তাঁকে লিখে জানালেন নিজের চিন্তা-ভাবনার কথা। সব জেনে টসকানেলি খুব উৎসাহ দিলেন কলাম্বাসকে। বললেন, সম্ভবত আপনার ধারণাই সত্যি। আপনি সাহস করে এগিয়ে যান। ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেলো কলাম্বাসের। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আবার বেরোবেন জাহাজ নিয়ে।

একটি নৌ অভিযান পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন হয় বহু অর্থ আর জনবলের। কিন্তু কলাম্বাসের তা ছিলো না। তাই একদিন তিনি অনেক আশায় বুক বেঁধে উপস্থিত হলেন পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনের দরবারে। তাঁকে খুলে বললেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি যে উল্টো দিকে জাহাজ চালাতে চাচ্ছেন, সে কথা জানাতেও ভুললেন না কলাম্বাস।

এ চিন্তাটা ছিলো সে সময়কার প্রচলিত ধারণা থেকে একেবারেই উল্টো। তাই রাজা জন উৎসাহ পেলেন না কলম্বাসের প্রস্তাবে। তিনি ভাবলেন, যে লোক দক্ষিণ দিককে অস্বীকার করে উত্তর দিকে আর পূর্ব দিকের বদলে পশ্চিম দিকে জাহাজ ভাসাতে চাইছে, নাবিক হিসেবে সে একেবারেই অজ্ঞ। এর পেছনে অর্থ ব্যয় করা হবে কাড়ি কাড়ি টাকা পানিতে ফেলা।

রাজা দ্বিতীয় জন তবু কলাম্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, এ অভিযান যদি সফল হয় তবে পর্তুগাল রাজার কাছে আপনি কি আশা করেন?

কলাম্বাস বললেন, আমি আপাতত তিনটি জাহাজ চাই আপনার কাছে। অবশ্যই জাহাজগুলোকে সমুদ্র যাত্রার উপযোগী করে সাজিয়ে দিতে হবে আপনাকেই।

ঃ তারপর ? আর কোনো চাহিদা আছে আপনার ?

জানতে চাইলেন দ্বিতীয় জন। কলাম্বাস বললেন, আছে। আমার অভিযানের ফলে যদি কোনো নৌপথ আবিষ্কৃত হয় এবং সে পথে বাণিজ্য করা হয়, তবে তার মুনাফার দশমাংশ দিতে হবে আমাকে।

ঃ আর কোনো ইচ্ছে ?

ঃ নতুন কোনো দেশ আবিষ্কৃত হলে সে দেশের গভর্নর নিয়োগ করতে হবে আমাকে।

ঃ আর কিছু ?

ঃ হ্যাঁ, মহামান্য রাজা। আর মাত্র একটি দাবি আছে আমার। সমুদ্র যাত্রার আগেই আমাকে এ্যাডমিরালের পদমর্যাদা দিতে হবে। আমার মৃত্যুর পর এসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে আমার একমাত্র ছেলে ডায়েগো কলাম্বাস।

রাজা দ্বিতীয় জন শুধু অবাকই হলেন না, রীতিমতো মনোক্ষুণ্ণও হলেন কলাম্বাসের দাবির ফর্দ দেখে। তবে ভদ্রতা বজায় রেখে সোজাসুজি নিরাশ করলেন না কলাম্বাসকে। বললেন, একটু সময় দিতে হবে আমাকে। আমি ভেবে দেখবো আপনার প্রস্তাবগুলো মেনে নেয়া যায় কিনা।

রাজা জন কলাম্বাসের কাছ থেকে তাঁর অঙ্কিত মানচিত্রগুলো রেখে দিলেন। সেই মানচিত্র দিয়ে গোপনে একদল নাবিককে পাঠালেন পশ্চিমে। উদ্দেশ্য, কলাম্বাসের প্রস্তাবের সত্যতা যাচাই করা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ফিরে এলো সেই নাবিক দল। তারা জানালো, পানি আর পানি। পশ্চিমে আর কিছু নেই। ওদিকে জাহাজ ভাসানো অর্থহীন।

এই নাবিকদের বক্তব্য শুনে রাজা বেঁকে বসলেন। আর রাজার মনোভাব জানতে পেরে খুব অপমানিত বোধ করলেন কলাম্বাস। এ কারণে তিনি পর্তুগাল ছেড়ে স্পেনে চলে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

রানী ইসাবেলার সুদৃষ্টি

ছেলেবেলা থেকেই কলাম্বাস ছিলেন একরোখা। একবার যা সিদ্ধান্ত নিতেন, যে কোনো মূল্যে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন। তাই পর্তুগালের রাজার কাছে সহযোগিতা না পেয়ে তিনি সত্যি সত্যিই স্পেনের পথে যাত্রা করলেন।

১৪৮৫ সালের কোনো এক দিন পাঁচ বছরের ছেলে ডায়েগোকে নিয়ে কলাম্বাস চলে এলেন স্পেনে। পালোস শহর থেকে একটা মেঠোপথ চলে গিয়েছিলো লা রেবিজ মঠ পর্যন্ত। ছেলেকে নিয়ে সেই পথেই এগোতে লাগলেন তিনি। ইচ্ছে, আপাতত ছেলেকে লা রেবিজ মঠে রেখে যাবেন। তারপর দেখা করতে চেষ্টা করবেন স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড আর রানী ইসাবেলার সাথে।

লা রেবিজ মঠের প্রধান জুয়ান পেরেজ ছিলেন রাজা-রানীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলাম্বাসের সাথেও সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তাঁর। কলাম্বাসের পরিকল্পনার কথা শুনে খুব উৎসাহিত বোধ করলেন তিনি। তাঁরই অনুরোধে রাজা-রানী সম্মত হলেন কলাম্বাসকে সাক্ষাৎ দানের জন্যে। শুধু তাই নয়, পথখরচা বাবদ কিছু টাকাও তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন কলাম্বাসকে।

রাজা ফার্ডিনান্ড আর রানী ইসাবেলা যখন কলাম্বাসকে সাক্ষাৎ দানের জন্যে সম্মত হয়েছিলেন, সে সময় মূরদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো স্পেন। তবুও তাঁরা ধৈর্য ধরে শুনলেন কলাম্বাসের কথা। তারপর বললেন কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্যে। সুতরাং শুরু হলো কলাম্বাসের অপেক্ষার পালা। একদিন দুদিন নয়,

পুরো ছয়টি বছর অপেক্ষা করলেন কলাম্বাস। এর মাঝে ১৪৮৭ সালে রিয়েট্রেস নামে এক যুবতীকে বিয়েও করলেন তিনি। ১৪৮৮ সালে জন্ম হলো তাঁদের একটি ছেলে। কলাম্বাস তার নাম রাখলেন সার্ভিন্যান্ড।

রাজা-রানী কলাম্বাসকে অপেক্ষা করতে বলে তাঁর পরিকল্পনা বিবেচনা করে দেখার জন্যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কয়েকজন মন্ত্রী ও বিজ্ঞানীর ওপর। একদিন তারা মত প্রকাশ করলেন–কলাম্বাসের প্রস্তাবে বাস্তবতার কোনো স্থান নেই। তাছাড়া তাঁর যা ধারণা এ পৃথিবী তার চেয়েও বহু বহু গুণ বড়ো। সুতরাং পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

রানী ইসাবেলা কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন মন্ত্রী আর বিজ্ঞানীদের সাথে। কারণ কলাম্বাসের ওপর ছিলো রানীর অগাধ বিশ্বাস। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন কলাম্বাসকে একবার সুযোগ দেবেন। এতে হয়তো নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হবে। স্পেনের জন্যে খুলে যাবে ঐশ্বর্যের দ্বার। আর খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারেরও সুযোগ হবে।

এর মধ্যে ঘটে গেলো আরেক কান্ড। স্পেনের যুদ্ধ শেষ হতেই কলাম্বাস তাঁর নিজের আর ছেলেদের জন্যে দাবি করে বসলেন রাজকীয় উপাধি। এ কথা শুনে রানী শুধু অবাকই হলেন না, মর্মাহতও হলেন। তিনি এতোটাই রেগে গেলেন যে, কলাম্বাসকে চলে যেতে বললেন দরবার ছেড়ে।

রাজদরবারে লুই দ্য স্যানটানেল নামে ছিলেন এক পারিষদ। কলাম্বাসকে তিনিও খুব পছন্দ করতেন–বিশেষ করে তাঁর পরিকল্পনা। এই ব্যক্তি আবার বোঝালেন রানীকে। আবার কলাম্বাসের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন তিনি। আর বললেন, কলাম্বাসের দাবিটা আপাত দৃষ্টিতে বেশিই মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখুন মহামান্যা রানী। এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে কলাম্বাসকে কতোটা পরিশ্রম করতে হয়েছে। কতো বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তিনি একজন সাহসী নাবিক। সমস্ত ঝুঁকি নিতে প্রস্তুতও তিনি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস স্পেনের জন্যে তিনি ঐশ্বর্যের দুয়ার খুলে দেবেন। বড়ো রকমের দাবি করার অধিকার তো তাঁর রয়েছেই।

স্যানটানেল রানী ইসাবেলাকে এমন ভাবে বোঝালেন যে, রানীর সব রাগ মন থেকে মুছে গেলো। তাছাড়া তিনিও পছন্দ করতেন দুঃসাহসী কলাম্বাসকে। তাই বললেন, ঠিক আছে, আমি মেনে নেবো কলাম্বাসের প্রস্তাব। এক্ষুনি ফিরিয়ে আনুন তাঁকে। যে করেই হোক কলাম্বাসের সমুদ্র যাত্রার ব্যয়ভার বহন করবো আমি। প্রয়োজন হলে আমার স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করতেও পিছপা হবো না।

এদিকে স্পেনের দরবার থেকে ফিরে কলাম্বাস তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন ফ্রান্সের দিকে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে করেই হোক সমুদ্র যাত্রায় বেরোবেনই তিনি। এবার যাবেন ফ্রান্সে। তারপর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। এর শেষে দেখে ছাড়বেন তিনি।

স্পেনের সীমান্তের কাছাকাছি রানীর পত্রবাহকের সাথে দেখা হলো কলাম্বাসের। কলাম্বাসকে জানানো হলো রানী তাঁর সব দাবি মেনে নিয়েছেন। তাঁকে এক্ষুনি স্পেনের রাজদরবারে উপস্থিত হবার জন্যে বলা হয়েছে। এই তো চেয়েছিলেন কলাম্বাস। সুতরাং আবার তিনি ফিরে চললেন রাজ দরবারে। আবার রানীর প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত হলেন তিনি। প্রস্তুতি নিতে লাগলেন সমুদ্র যাত্রার।

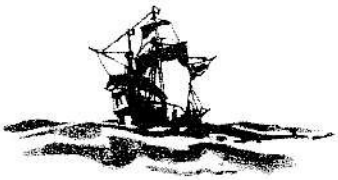

পুবের খোঁজে পশ্চিমে

দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করা হলো রানী ইসাবেলার তত্ত্বাবধানে। রাজকোষ থেকে খরচ করা হলো অঢেল অর্থ। সান্তা মারিয়া, পিন্টা আর নিনা নামে তিনটি জাহাজ প্রস্তুত করা হলো পালোস বন্দরে। সে জাহাজ সজ্জিত করা হলো নানা রঙের নিশান আর কাগজের শিকল দিয়ে। তারপর তোলা হলো রসদপত্র। জাহাজে উঠে বসলো নাবিকারা। তোলা হলো পাল।

১৪৯২ সালের ৩ আগস্ট পালোস বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করলো তিনটি জাহাজ। সবচেয়ে বড়ো জাহাজ সান্তা মারিয়ার ক্যাপটেন মনোনীত হলেন কলাম্বাস। মাঝারি জাহাজ পিন্টার দায়িত্ব দেয়া হলো ক্যাপটেন মার্টিন পিনজনকে। পিনজনের ছোট ভাই মার্টিন ভিনসেন্টকে দেয়া হলো সবচে ছোট জাহাজ নিনার দায়িত্ব।

জাহাজ তিনটি বন্দর ত্যাগ করতেই কলাম্বাস তাকালেন ওপর দিকে। দেখলেন ধবধবে নতুন পালের ওপর পতপত করে ওড়ছে স্পেনের পতাকা। তারও ওপর খ্রিস্ট ধর্মের প্রতীক ক্রস চিহ্ন অঙ্কিত আরেকটি পতাকা। তা দেখে কলাম্বাস আরও খুশি হলেন। তিনি ভাবলেন, যে সব নতুন দেশে যাবেন তিনি, সেখানে প্রচার করবেন যীশুর অমর বাণী। তুলে ধরবেন খ্রিস্ট ধর্মের মহিমা।

এ সময় কলাম্বাসের মনে পড়লো তাঁর দুই ছেলের কথা। কর্ডোভাতে রেখে এসেছেন তাদের। সেখানেই লেখাপড়া করবে ওরা।

কলাম্বাস কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন লা রেবিজ মঠের প্রধান জুয়ান পেরেজের কথা। এ মানুষটি সবচে বেশি সাহায্য করেছেন কলাম্বাসকে। পেরেজেই প্রথম

রাজা-রানীর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেন তাঁকে। আবার তিনিই নিনা ও পিন্টা জাহাজের ক্যাপটেনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর অনুরোধেই এ অভিযানে কলাম্বাসের সঙ্গী হতে রাজি হয় সেই দুই ভাই। তাছাড়া তিনটি জাহাজের জন্যে যে নব্বইজন নাবিককে মনোনীত করা হয়েছে, তার পেছনেও পেরেজের ভূমিকা ছিলো প্রশংসনীয়। কারণ কলাম্বাসের প্রস্তাবিত অনিশ্চিত যাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে সম্মত ছিলো না কেউই। পেরেজই তাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করান এ অভিযানে অংশ নিতে।

জাহাজ তখন ছুটে চলেছে সমুদ্রের বুক চিরে। ছোট-বড়ো ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। ধীরে ধীরে দূরে চলে গেলো পালোজ বন্দর। কলাম্বাস তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন। এক সময় পালোসের পার্শ্ববর্তী এলাকার পাহাড়গুলোও চলে গেলো চোখের আড়ালে। পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে থাকা লা রাবিডা গির্জাটাও আর দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে শুধু নীল সমুদ্র। শুধু নীল পানি আর পানি।

আরোও কিছুটা সময় ব্রিজে দাঁড়িয়ে থেকে দড়ির মই বেয়ে ডেকে নেমে এলেন কলাম্বাস। তারপর ধীরে ধীরে ঢোকলেন তাঁর কেবিনে।

রোজনামচা লেখা ছিলো কলাম্বাসের নিত্যদিনের অভ্যাস। আজ সমুদ্র যাত্রার প্রথম দিন। রোজনামচার পাতায় তিনি লিখলেন ঃ

'প্রভু যীশুর নামে আরম্ভ করছি।

রোজ রাতে সেই দিনের ঘটনাগুলো লিখে রাখবো, আর প্রতিদিন সকাল বেলা আগের রাতের ঘটনাগুলো লিখবো। এ ছাড়াও সমুদ্র পথের একটা মানচিত্র ও নকশা আঁকতে থাকবো। তাতে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল দেখানো হবে।'

কলাম্বাসের এই রোজনামচাটি ছিলো খুবই মজার ও তথ্যপূর্ণ। বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছিলো এটি।

জাহাজগুলো চলতে লাগলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আফ্রিকার কেনাবি দ্বীপগুলো লক্ষ্য করে। এ যাত্রা শুরু হবার পর মাত্র তিনদিন কেটেছে কি কাটে নি, হঠাৎ ভেঙ্গে গেলো পিন্টার হাল। পরে জানা গেলো এ অভিযান যেনো বাতিল করা হয়, সে জন্যেই এক নাবিক গোপনে ভেঙ্গে দিয়েছিলো হালটি।

কলাম্বাস আর মার্টিন পিনজনের দক্ষ পরিচালনায় ভাঙ্গা হাল নিয়েই পিন্টা পৌঁছে গেলো কেনাবিতে। এখানে সবচে আগে পিন্টা জাহাজের ভাঙ্গা হাল

মেরামত করা হলো। এ কাজে ব্যয় হলো পুরো একুশটি দিন। এই দীর্ঘ সময় খাঁচায় বন্দি সিংহের মতো শুধু অস্থির ভাবে পায়চারি করে কাটালেন কলাম্বাস।

কেনাবি থেকে কিছু রসদপত্র নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো কলাম্বাসের। সে দিনটি ছিলো ১৪৯২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। এদিন রোজনামচায় তিনি লিখলেন ঃ

'সোজা পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাতে লাগলাম। পশ্চিমই আমার গন্তব্য। পশ্চিম, শুধু পশ্চিম।'

কলাম্বাস অঙ্কিত মানচিত্রে জাপানকে দেখানো হয়েছিলো পশ্চিমের একটি দেশ হিসেবে।

প্রথম প্রথম ভালোই কাটলো। আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। অনুকূল বাতাসের প্রশ্রয় পেয়ে জাহাজগুলো এগোচ্ছিলো তরতর করে। কিন্তু যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো নাবিকদের মন। এ অস্থিরতা নতুন কোনো ভূখন্ডে পৌঁছানোর জন্যে।

জাহাজের নাবিকরা ভাবছিলো কলাম্বাস এক পাগলাটে লোক। কোনো দিনই তিনি কোনো নতুন দেশে পৌঁছাতে পারবেন না। আর তাদেরও দেশে ফেরা হবে না– জাহাজেই পচে মরতে হবে।

কলাম্বাস ছিলেন দক্ষ নাবিক। তাছাড়া প্রখর বুদ্ধিও ছিলো তাঁর। জাহাজের গতিপথ ও অগ্রগতির যে হিসেব লেখা হতো প্রতিদিন, সে হিসেবের দুটো কপি করতেন তিনি। তবে দুটি হিসেব থাকতো দুরকম। একটা আসল হিসেব আর একটা নকল। নকলটা দেখানো হতো নাবিকদের। যেনো দেশ থেকে খুব বেশি দূরে চলে এসেছে বলে তারা ঘাবড়ে না যায়।

এ সম্পর্কে কলাম্বাস লিখেছেন ঃ

'একবার আসল হিসেবে লিখলাম আজ জাহাজ ঘণ্টায় দশ মাইল করে ৬০ লিগ অর্থাৎ ১৮০ মাইল এগিয়েছে। আর নাবিকদের দেখাবার জন্যে লিখা হলো সারাদিনে ৪৮ লিগ অর্থাৎ ১৪৪ মাইল এগিয়েছি আমরা।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগলো। কোনো দ্বীপ বা দেশের চিহ্নও খুঁজে পেলেন না কলাম্বাস। ফলে নাবিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। নানাজনে নানা কথা বলতে লাগলো। কেউ বললো, সমুদ্রের মাঝে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে পানি খুব গরম। হাঁড়ির ভেতর পানি যেমন টগবগ করে ফোটে–সমুদ্রের পানিও তেমনি ফুটে চলেছে সেখানে অনবরত। এসব জাহাজ সেখানে গিয়ে পড়লে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

অন্যদল বললো, তারা শুনেছে সমুদ্রে বিশাল এক অদ্ভুত প্রাণী আছে। তার সামনে পড়লে আস্তো জাহাজ সে গিলে খায়। কপালে অমন প্রাণীর মুখে পড়া আছে কিনা, তাই বা কে জানে?

নাবিকদের ভয় পাবার পেছনে অবশ্য আরো একটি কারণও ছিলো। তখন সমুদ্রে জাহাজ চলছিলো অস্বাভাবিক গতিতে। এতে ভয়ের কারণ এই যে, খুব

অল্প সময়ের ভেতর স্পেন থেকে খুব দূরে সরে যাচ্ছিলো তারা। এটা নাবিকদের কাম্য ছিলো না। তারা চাইছিলো দেশের কাছাকাছি থাকতে।

নাবিকরা কলাম্বাসকে জানালো তাদের আশঙ্কার কথা। বললো, আমরা আর সামনে এগোতে রাজি নই। আপনি স্পেনে ফিরে চলুন। কলাম্বাস বললেন, এতো দূর এসে ফিরে যাবো, তা কি করে হয়? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আর কয়েক দিন চলতে পারলেই ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের দেখা পাবো আমরা। তখন আমাদের সবার হাতে আসবে প্রচুর ধন সম্পদ। একটু ধৈর্য না ধরলে সফলতা আসবে কেমন করে?

নাবিকরা বললো, আমাদের ধারণা এ জাহাজ কোনো দিনই মাটির দেখা পাবে না। এখনো সময় আছে। চেষ্টা করলে হয়তো আমরা স্পেনে ফিরে যেতে পারবো। চলুন ফিরে যাই।

কলাম্বাস খুব করে বুঝিয়ে শান্ত করলেন নাবিকদের। বললেন, আর কয়েকটা দিন সময় দাও। এর মাঝে কোথাও না কোথাও পৌঁছে যাবোই আমরা।

সে রাতেই ঘটলো আরেক ঘটনা। জাহাজের মাস্তুলের ওপর থেকে এক নাবিক চিৎকার করে জানালো দূরে সাদা সাদা দালান-কোঠা দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত কোনো শহর হবে ওটা।

নাবিকদের মাঝে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলো। গান-বাজনা শুরু হয়ে গেলো জাহাজে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেলো সব চোখের ভুল। সম্ভবত সাদা সাদা মেঘমালাকেই বেচারা নাবিক শহর বলে মনে করেছিলো। অতি ব্যাকুলতার কারণে এমন ভুল তো যে কারোরই হতে পারে।

এ ঘটনার পর কেটে গেলো আরো কয়েকটি দিন। জাহাজ চলছে পূর্ণ গতিতে। কিন্তু ভূখন্ডের দেখা নেই! অবশেষে এলো অনাকাঙ্ক্ষিত চরম সময়। কেনাবি বন্দর ছেড়ে আসার চৌত্রিশ দিন পর ১৪৯৮ সালের ১০ অক্টোবর নাবিকরা করে বসলো প্রকাশ্য বিদ্রোহ। তারা বললো, জাহাজের মুখ স্পেনের দিকে ঘোরাতেই হবে আপনাকে। আমরা দেশেই ফিরে যাবো। আর সামনে এগোবো না। অন্য জাহাজের নাবিকরা বললো, এ অভিযান বাতিল না করলে আমরা হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেবো আপনাকে। দেশে রয়েছে আমাদের স্ত্রী-সন্তান। তাদের কাছে ফিরে যাওয়া কর্তব্য আমাদের।

কলাম্বাস অনেক বোঝালেন নাবিকদের। অনেক প্রলোভন দেখালেন। নতুন দেশ আবিষ্কৃত হলে মুহূর্তে ওরা কে কতোটা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবে, সে স্বপ্ন দেখালেন। কিন্তু নাবিকদের এককথা– আমরা আর যেতে চাই না সামনে। ফিরে চলুন স্পেনে।

যখন কিছুতেই শান্ত করতে পারলেন না, তখন কলাম্বাস বললেন, আচ্ছা তিনদিন সময় দাও আমাকে। তিনদিনের ভেতর যদি কোথাও পৌঁছোতে না পারি, তবে ফিরেই যাবো আমরা।

নাবিকরা মেনে নিলো এ প্রস্তাব। ভাবলো, এ বরং মন্দের ভালো। তিনদিন পর তো জাহাজের মুখ ঘুরবে।

কলাম্বাসের ভাগ্য ভালো। জাহাজের মুখ আর ঘোরাতে হলো না। পরদিন দেখা গেল জাহাজের পাশ দিয়ে ভাঙ্গা ডালপালা ভেসে যাচ্ছে। আরো পরে দেখা গেলো আকাশে দু'একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে। এসব দেখে নাবিকদের মনে আশার সঞ্চার হলো। পরের রাতে কলাম্বাস বললেন, এক মুহূর্তের জন্যে একটা ক্ষীণ আলো যেনো চোখে পড়েছিলো আমার! নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও দ্বীপ আছে। চলো এগিয়ে যাই।

কলাম্বাসের কথা শুনে নাবিকদের মাঝে উৎসাহ বেড়ে গেলো। দড়ির মই বেয়ে মাস্তুলের ওপর উঠে দেখতে লাগলো তারা চারদিক। সবার ইচ্ছে, নতুন দেশটা যেনো সে-ই প্রথম দেখতে পায়। আল্লাহই জানেন কি আছে কপালে। শেষ কালে আবার হতাশ হতে হবে না তো?

১২ অক্টোবর রাত দুটোর সময় পিন্টা জাহাজ থেকে প্রথম ঘোষণা করা হলো, কূল দেখা যাচ্ছে। সামনেই বিশাল ভূখন্ড।

ভোর হবার সাথে সাথে আনন্দে সবাই চিৎকার করতে লাগলো। এবার সত্যি সত্যিই মাটির দেখা পেয়েছে তারা। ঐ যে সবুজ বন আর বালুকাময় বেলাভূমি দেখা যাচ্ছে।

ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকো নামানো হলো পানিতে। সেই নৌকোয় প্রথম উঠে বসলেন কলাম্বাস। তারপর ক্যাপটেন মার্টিন পিনজন। সাথে আরো কয়েকজন নাবিক। তারা সাবধানে নৌকো চালিয়ে নামলেন সাগর পাড়ে। সবচে আগে হাঁটু গেড়ে বসে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন মাটির দেখা পাইয়ে দেবার জন্যে। পরে উত্তোলন করলেন স্পেনের পতাকা। তার অর্থ হলো এই যে, এখন থেকে এই নতুন ভূখন্ডের অধিকারী একমাত্র স্পেন–অন্য কোনো দেশ নয়।

কলাম্বাস ভাবলেন ইন্ডিজেরই কোনো দ্বীপে নেমেছেন তাঁরা। এ কারণেই স্থানীয় অধিবাসীদের নাম রাখলেন তিনি ইন্ডিয়ান। এ সম্পর্কে রোজনামচায় লিখলেনঃ

'এখানকার অধিবাসীরা বেশ স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত আর দেখতেও সুশ্রী। আমি তাদেরকে কয়েকটি লাল টুপি, পুতির মালা আর নানা রকম ছোটখাটো জিনিস উপহার দিয়েছি। এতে তারা ভারি খুশি। খুব অল্প সময়ে এরা আমাদের অনুগত

হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ সাঁতরে আমাদের জাহাজেও উঠেছিলো। সাথে করে এরা নিয়ে এসেছিলো তোতা পাখি, তুলার মন্ড আর চেনা অচেনা আরো উপহার সামগ্রী।'

আবিষ্কৃত এলাকার অধিবাসীরা কলাম্বাস আর তাঁর নাবিকদের ভাবতে লাগলো 'সূর্য দেবতার লোক'। তাই কলাম্বাসের চাহিদা মতো সবকিছুই সরবরাহ করতে লাগলো ওরা।

সত্যিকথা হলো, ইন্ডিজে নয়, ফ্লোরিডার উপকূলে যেগুলোকে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়, তারই কোনোটিতে পৌঁছেছিলেন কলাম্বাস। তিনি দ্বীপটির নাম দিলেন স্যান স্যালভাডোর–যার অর্থ পবিত্র ত্রাণকর্তা। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন কলাম্বাস। তবে তাঁর রয়েছে আরো বড়ো কাজ। চীন অথবা জাপানে যেতেই হবে তাঁকে। তাই নতুন করে পাল তোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

স্যান স্যালভাডোর ত্যাগ করার কয়েক দিনের মধ্যেই আরো একটি সুন্দর দ্বীপ আবিষ্কার করলেন কলাম্বাস। এটি আজকাল কিউবা নামে পরিচিত।

কিউবা এসে কলাম্বাস ভাবলেন চীন দেশের কোনো প্রদেশে পৌঁছে গেছেন তিনি। কয়েকজনকে নামানো হলো এ জায়গাটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে। তারা দেখতে পেলো স্থানীয় জনসাধারণ তামাক পাতার চুরুট টানছে। দৃশ্যটা ছিলো একেবারেই নতুন এদের জন্য। কারণ ইউরোপের মানুষ এর আগে কখনো চুরুট বা সিগারেট খেতে দেখে নি।

এখন যে জায়গাটাকে হিস্পানিওয়ালা বলা হয়, সেই দ্বীপটিও আবিষ্কার করলেন কলাম্বাস। এখানকার গরম হাওয়া আর সুন্দর গাছপালা দেখে কলাম্বাসের মনে পড়ে গেলো স্পেনের কথা। সত্যিকথা বলতে কি, মাতৃভূমি স্পেন না হলেও সে দেশটিকে তো কলাম্বাস মাতৃভূমির মতোই ভালোবাসেন।

১৪৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর বিকেলে ঘটলো এক দুর্ঘটনা। চলতে চলতে প্রচন্ড এক শব্দ হলো। তারপরই একদিকে কাৎ হয়ে গেলো সান্তা মারিয়া। সাথে সাথে মুখ কালো হয়ে গেলো কলাম্বাসের। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর জাহাজ কোনো ডুবো পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। আসলেও ঘটেছিলো তাই। কারণ একটু পরেই নিচ থেকে একজন চিৎকার করে জানালো, জাহাজের খোল ফেটে গেছে। জাহাজে পানি উঠছে।

কলাম্বাস বুঝতে পারলেন সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। এ জাহাজ আর বাঁচানো যাবে না। তাই তিনি হুকুম দিলেন যতোটুকু সম্ভব মালপত্র বাঁচিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিতে। স্থানীয় অধিবাসীরাও আন্তরিকভাবে সাহায্য করলো এ কাজে। ফলে সবকিছুই রক্ষা করা সম্ভব হলো–এমন কি সান্তা মারিয়ার ভাঙ্গা কাঠের

টুকরোগুলোও। সেসব দিয়ে কলাম্বাস গড়ে তুললেন একটা চমৎকার দুর্গ। এ দুর্গের নাম দিলেন তিনি 'লা নাবিদাহ'।

এতোদিনে চুলে পাক ধরেছিলো কলাম্বাসের। দেশের কথাও মনে পড়ছিলো খুব। ছেলে দুটো রয়েছে সেখানে। তাই একদিন তিনি স্পেনে ফিরে যাবার কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু এবার তাঁর সঙ্গীদের অনেকেই বেঁকে বসলো ফিরে যেতে। তারা চাইলো এখানেই থেকে যেতে। উদ্দেশ্য সোনা সংগ্রহ করা।

কি আর করবেন কলাম্বাস। বাধ্য হয়ে চল্লিশজন নাবিককে রেখে গেলেন এখানে। তাদের জন্যে রেখে গেলেন প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী আর গোলাবারুদ। তারপর স্পেনের পথে জাহাজ ভাসালেন কলাম্বাস। এবার তিনি হলেন নিনা জাহাজের ক্যাপটেন।

এর আগে পিন্টা জাহাজটি একাই রওনা দিয়েছিলো নতুন দেশের সন্ধানে। দু একদিন পর পিন্টার সাথে দেখা হয়ে গেলো নিনার। তখন দুটি জাহাজ পাশাপাশি চলতে লাগলো।

কলাম্বাস মোটামুটি পরিতৃপ্ত। তাঁর ধারণা তিনি ইন্ডিজ দ্বীপে পৌঁছেছিলেন। তবে যে পরিমাণ ধনরত্ন, সোনা পাবেন বলে ধারণা ছিলো, ততোটা পাননি। তাই বলে একেবারে কমও নয় তার পরিমাণ। সে সব নিয়েই স্পেনে ফিরে চললেন কলাম্বাস। আর সাথে নিলেন এ এলাকার গাছপালা, পাখি আর রানীর জন্যে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী।

জাহাজ দুটো একই সাথে পেরিয়ে গেলো বিশাল সমুদ্র আটলান্টিক। তারপর আবার নেমে এলো এক কঠিন সমস্যা। আকাশ কালো হয়ে গেলো খন্ড খন্ড মেঘে। তারপরই নেমে এলো ঝড়। সেই ঝড়ের সাথে আছড়ে পড়তে লাগলো বড়ো বড়ো ঢেউ। জাহাজের পাটাতন ভিজে যেতে লাগলো পানির তোড়ে। বারবার ডুবে যেতে যেতে কোনোরকমে ভেসে রইলো জাহাজ দুটি।

নিনা আর পিন্টার এই দুর্যোগের সময় কলাম্বাস দেখালেন তাঁর নৌবিদ্যায় আসল দক্ষতা। নাবিকদের তিনি নির্দেশ দিলেন ঝড়ের মুখোমুখি জাহাজ চালিয়ে যেতে। আর বললেন হাল শক্ত করে ধরে রাখতে। তাই করলো দু জাহাজের নাবিকরা। ফলে এ যাত্রা বেঁচে গেলো জাহাজ দুটো।

এরপর আরো দু একবার ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন কলাম্বাস। তবে খুব একটা সমস্যা হয়নি তাতে। কারণ তাঁর দক্ষ পরিচালনায় প্রতিবারই উৎরে যেতে পেরেছিলেন তারা।

একটানা কয়েক মাস চলার পর ১৪৯৩ সালের ১৫ মার্চ নিনা ভিড়লো প্রথম পালোস বন্দরে। সেই দিনই কিছুক্ষণ পর পিন্টাও প্রবেশ করলো সেখানে।

কলাম্বাস ফিরে এসেছেন–এ খবর মুহূর্তের ভেতর রটে গেলো সারা শহরে। শত শত লোক ছুটে এলো জাহাজ দুটো আর তার নাবিকদের দেখতে। তখনকার দিনের পুরাতন পৃথিবীর মানুষের কাছে এ ছিলো এক দুর্লভ সংবাদ। সবার মুখে এক কথা–কলাম্বাস ফিরে এসেছেন। ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের ধনরত্নের দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি।

স্পেনের রাজা-রানী তখন ছিলেন বারসেলোনায়। এ খবর পৌঁছে দেয়া হলো তাঁদের কাছে। তাঁরা কলাম্বাসকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন সেখানে যাবার জন্যে। কলাম্বাসকে সসম্মানে বারসেলোনা নিয়ে যাবার জন্যে কয়েকজন পরিষদকেও পাঠানো হলো পালোসে। একটা হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াও পাঠালেন রানী ইসাবেলা। এদের সাথে পাঠানো হলো আরো অনেক কিছু।

পালোস থেকে বারসেলোনা অনেকটা পথ। কলাম্বাস তাঁর নাবিক সাথীদের নিয়ে যাত্রা করলেন সেই বারসেলোনার পথে। সাথে নিলেন ভিন দেশ থেকে আনা তোতা, ময়না আর টিয়া পাখি। গাছগাছালির চারা আর সেখান থেকে আনা ইন্ডিয়ানদের সাথে নিতেও ভুল হলো না তাঁর।

বারসেলোনা যাবার পথে পড়লো কর্ডোভা নগরী। এখানেই দুই ছেলেকে রেখে গিয়েছিলেন কলাম্বাস। তাই যাত্রা বিরতি করলেন তিনি কর্ডোভাতে। আমোদ প্রমোদ করে কাটালেন কয়েকদিন ছেলেদের সাথে। তারপর আবার এগিয়ে চললেন বারসেলোনার দিকে।

ততোদিনে রাজা-রানী অধীর হয়ে উঠেছিলেন কলাম্বাসের মুখোমুখি হবার জন্যে। নানা প্রদেশ থেকে বহু গণ্যমান্য লোকও এসেছিলেন এই দুঃসাহসী মানুষটিকে এক নজর দেখার জন্যে।

অবশেষে একদিন বারসেলোনা গিয়ে পৌঁছলেন কলাম্বাস। সসম্মানে তাঁকে নেয়া হলো রাজদরবারে। তাঁর সম্মানে রাজা-রানী উঠে দাঁড়ালেন। কলাম্বাস হাঁটু গেড়ে বসে নতজানু হয়ে সম্মান জানালেন রাজা-রানীকে। রানী তখন কলাম্বাসকে তাঁদের পাশে আসন গ্রহণ করার জন্যে বললেন। আনন্দে চোখে পানি এসে গেলো কলাম্বাসের। ধীরে ধীরে তিনি গিয়ে বসলেন রানীর পাশে। তারপর এক এক করে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন তাঁর আনা উপঢৌকন। রানী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অনেক কথা। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

এবার রাজা-রানীর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার পালা। রাজা ফার্ডিনান্ড কলাম্বাসকে এডমিরাল অব দ্য ওসেন সি উপাধিতে ভূষিত করলেন। সে সঙ্গে তাঁকে ইন্ডিজ দ্বীপের রাজ প্রতিনিধি পদে বহাল করা হলো।

কলাম্বাসের সম্মানে একের পর এক ভোজসভার আয়োজন হতে লাগলো। মানুষ শতমুখে প্রশংসায় ফেটে পড়লো কলাম্বাসের। আবার কেউ কেউ হিংসেও

শুরু করলো। তাদের ধারণা, একটি উটকো নাবিককে রাজা-রানী খুব বেশি সম্মান দেখাচ্ছেন। এতোটা উচিত নয়।

একদিন এই অসন্তোষের প্রমাণ পাওয়া গেলো এক ভোজসভায়। এক আমন্ত্রিত ব্যক্তি বলে বসলেন, আপনি আবিষ্কার না করলেও একদিন না একদিন এসব দেশ আবিষ্কৃত হতোই। এতে আর বাহাদুরির কি আছে?

কলাম্বাস প্রথমে চুপ করে রইলেন। তারপর টেবিলের ওপর থেকে খোসা সমেত একটি সিদ্ধ ডিম তুলে নিয়ে বললেন, এ ডিমটাকে আপনারা টেবিলের ওপর খাড়া করে রাখুন। আপনারা না পারলে আমি তা অবশ্যই পারবো।

এক এক করে সবাই চেষ্টা করলেন ডিমটিকে দাঁড় করিয়ে রাখতে। কিন্তু কারোর পক্ষেই তা সম্ভব হলো না। তখন কলাম্বাস ডিমের এক মাথার শক্ত খোসাটাকে থেতলে নিয়ে খুব সহজেই টেবিলের ওপর দাঁড়া করালেন ওটা। সবাই মুগ্ধ হলেন কলাম্বাসের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে।

কলাম্বাস বললেন, এখন যদি আবার এমন একটি ডিম আপনাদের দেয়া হয়, আপনারা খুব সহজেই ওটাকে দাঁড় করাতে পারবেন। কারণ আমি পথ দেখিয়ে দিয়েছি কি করে তা করতে হয়। এটাই নিয়ম। আমি পরিশ্রম করে ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছি। মানচিত্র এঁকে এনেছি। পথের বিবরণ নোট করেছি। এখন অনেকেই অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারবে সেখানে। কিন্তু প্রথম কিছু করার জন্যে কলাম্বাসের মতো মানুষদের প্রয়োজন হয়।

কয়েকদিন আরাম-আয়েসে কাটাবার পর আবার হাঁপিয়ে উঠলেন কলাম্বাস। আবার তিনি রাজাকে বললেন, চীন দেশটা আবিষ্কার করা হয়নি গতবার। এবার আমি চীন খুঁজে বের করবো। চীনের সম্রাটের কাছে পৌঁছে দেবো আপনার চিঠি। তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করার সহজ পথ আবিষ্কার করবো। আর খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করবো তাদের মাঝে। আপনি অনুমতি দিন।

রানী ইসাবেলা বললেন, আপনার ইচ্ছের প্রতি সম্মান জানাতে সব সময়ই প্রস্তুত আমরা। ঠিক আছে, আপনি প্রস্তুত হোন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবারো নিশ্চয়ই সফল হবেন আপনি।

রাজাও সম্মতি জানালেন কলাম্বাসের প্রস্তাবে। ফলে দ্বিতীয়বার নৌ অভিযানে বেরুবার জন্যে তৈরি হলেন কলাম্বাস।

আবার সমুদ্র—আবার অভিযান

কলাম্বাসের প্রথম অভিযানের পর কেটে গেছে দশটি বছর। এ সময়ের ভেতর তিনবার অভিযানে বেরিয়েছেন তিনি। প্রতিটি অভিযানই ছিলো সফল অভিযান। এ সময় অনেকগুলো নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছেন তিনি। সেগুলোতে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্পেনের উপনিবেশ।

কলাম্বাস তৃতীয় অভিযানে বেরিয়েছিলেন ১৪৯৮ সালে। এ সময় আমেরিকার মূল ভূখন্ডেও তিনি অবতরণ করেছিলেন। আমেরিকা অবতরণের পর কলাম্বাস তাঁর রোজনামচায় লিখেছিলেন ঃ

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মহাদেশটির মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা খুঁজে পেলেই আমরা চীন-জাপান ভূখন্ডে পৌঁছতে পারবো।'

কলাম্বাসের এ ধারণা খুব একটা ভুল ছিলো না। কারণ চীন ও জাপানের অবস্থান প্রকৃতই আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমে। কিন্তু এর মাঝখানে যে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর পথ আগলে রয়েছে, সে কথা একেবারেই জানা ছিলো না তাঁর। তৃতীয় অভিযানের সময় কলাম্বাসকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বারবার সংঘর্ষ বাধে তাঁর। এদিকে প্রথম অভিযানের সময় লা নাবিদাহ দুর্গে যে চল্লিশজন সঙ্গী রেখে এসেছিলেন, তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করেছিলো ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধে।

কলাম্বাসের নিজের লোকদের মাঝেও ছিলো নানা অভিযোগ। তাদের ধারণা কলাম্বাস তাদেরকে আহরিত সম্পদের ন্যায্য ভাগ দিচ্ছেন না। তাছাড়া অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েও কারো কারো সাথে দ্বিমত হলো কলাম্বাসের। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে, তা একেবারেই কলাম্বাসের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো। এ সুযোগে শত্রুরা বন্দী করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলো স্পেনে। আর সে সাথে পাঠানো হলো অভিযোগের তালিকা। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দু বিখ্যাত ব্যক্তিকেও পাঠালো রাজদরবারে। তারা সত্যি-

মিথ্যেয় মিলিয়ে অনেক কথা বললেন রাজাকে। তা শুনে রাজা অসন্তুষ্টই হলেন। তাছাড়া কলাম্বাসের প্রতি অভিযোগ তাঁরও ছিলো। যতো সোনা তাঁর প্রয়োজন ছিলো কলাম্বাস তা তাঁকে দিতে পারছিলেন না। এ কারণে রাজার ধারণা ছিলো কলাম্বাস তাঁকে প্রতারণা করে চলছেন।

সব প্রতিকূলতা জয় করে চতুর্থবার অভিযানে বেরোলেন কলাম্বাস। এবার সাথে নিলেন তিনটি জাহাজ। তিনি ছিলেন ক্যাপিটেনিয়া নামে সবচে বড়ো জাহাজটিতে। এ অভিযানের সময় কলাম্বাস অবতরণ করলেন আমেরিকার ভেরাগুয়াতে। এখানে আশাতীত সোনার সন্ধান পেলেন তিনি।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগ স্থলে যে জায়গাটিকে পানামা বলা হয়, ভেরাগুয়া সেখানেই অবস্থিত। এখানে বোলন নদীর মোহনায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করলেন কলাম্বাস।

একদিন ক্যাপিটেনিয়া জাহাজে বসে কলাম্বাস ভাবছিলেন তাঁর সাফল্য-ব্যর্থতার কথা–ভাবছিলেন, এতোদিনে আল্লাহ মুখ তুলে তাকিয়েছেন। এবার জাহাজ ভরে ফেলা যাবে সোনা দিয়ে। রাজার চাহিদাও মেটানো যাবে। নাবিকদের মনেও নিশ্চয়ই আর অসন্তুষ্টি থাকবে না।

এসব ভাবছেন কলাম্বাস–হঠাৎ তীরে শুরু হলো হৈহল্লা। শুনতে পেলেন ইন্ডিয়ানদের রণ দামামার ঢপঢপ শব্দ। সেই শব্দ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন কিছু একটা হয়েছে কোথায়ও। কিন্তু কি হয়েছে বুঝতে পারলেন না।

স্পেনে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছিলো নাবিকরা। এদেরই কেউ কেউ গেছে বোলন নদী থেকে মিঠে পানি সংগ্রহ করার জন্যে। কলাম্বাসের দশ বছর বয়েসী ছেলে তার চার-পাঁচজন বন্ধু নিয়ে গেছে দ্বীপটা একটু ঘুরে দেখার জন্যে। ওদের কোনো বিপদ হলো না তো?

কম্পিত হস্তে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে কলাম্বাস তাকালেন তীরের দিকে। কিন্তু গাছপালার জন্যে কিছুই চোখে পড়লো না তাঁর। তবে একটি লোককে নৌকো বেয়ে আসতে দেখলেন জাহাজের দিকে। একটু পরেই চিনতে পারলেন সেই লোকটিকে। সে আর কেউ নয়, তাঁরই বন্ধু ভায়েগো মেনডিজ।

ভায়েগো চিৎকার করে বললো, সর্বনাশ হয়েছে ক্যাপটেন। ইন্ডিয়ানরা আমাদের আক্রমণ করেছে। এরই মাঝে আমাদের দশজন মারা গেছে। ওরা তীর বর্ষা ছুড়ে মারছে চোখ লক্ষ্য করে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন কলাম্বাস। বললেন, চলে এসো সবাই। দরকার নেই আমাদের এখানে থেকে। এরা বন্ধুভাবাপন্ন নয়।

অবশেষে দুটি নৌকোতে করে বারবার চেষ্টা চালিয়ে জীবিত নাবিকদের ফিরিয়ে আনা হলো জাহাজে। তারপর ছেড়ে দেয়া হলো ক্যাপিটেনিয়া। তাকে

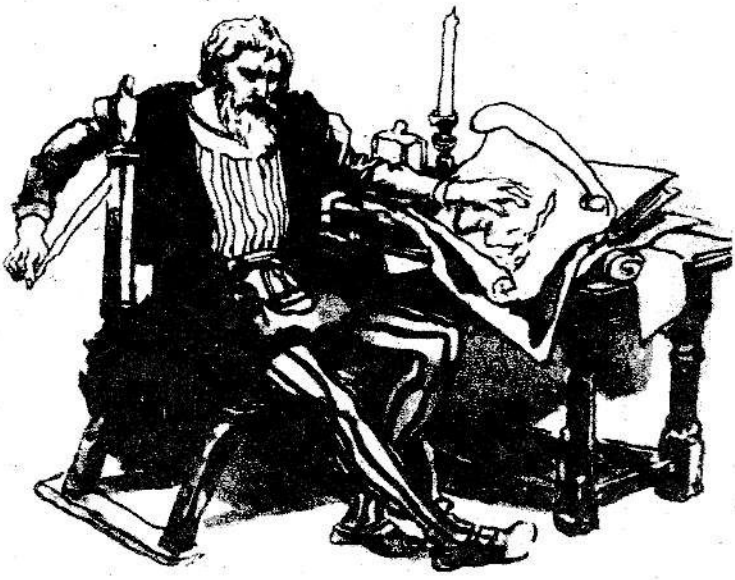

অনুসরণ করে চললো অন্য দুটি জাহাজ। যে সব সোনা সংগ্রহ করেছিলেন, তা পড়ে রইলো সমুদ্রের তীরে। আরও ফেলে যেতে হলো দশ সঙ্গীর মৃতদেহ।

দিন চলছিলো ভালোই। এগোচ্ছিলো জাহাজগুলো স্পেনের দিকে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো হঠাৎ। দেখা গেলো মেরামতের অভাবে ফেটে গেছে তিনটি জাহাজেরই তলা। পানি উঠতে লাগলো তিনটি জাহাজেই। একটা ছিলো মেরামতের একেবারেই অযোগ্য। ওটার মালপত্র অন্য দুটিতে সরিয়ে নিয়ে চিরতরে ত্যাগ করা হলো ওটা।

এর পরপরই কলাম্বাস পড়লেন আরেক বিপদে। দমকা বাতাস ঠেলে ঠেলে জাহাজ দুটোকে নিয়ে ঠেকালো জ্যামাইকা দ্বীপে। আগের এক অভিযানে কলাম্বাসই আবিষ্কার করেছিলেন এ দ্বীপটি।

জ্যামাইকা দ্বীপ থেকে মেনডিজ যাবার জন্যে তৈরি হলেন কলাম্বাস। এদিকে জাহাজ দুটির অবস্থাও ভালো নয়। ও দুটো সারাতে হবে। রসদপত্র যোগাতে হবে। এসব করতে করতেই কেটে গেলো পুরো একটি বছর। এ সময়ের ভেতর খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলো জাহাজে। অবস্থা এমন হলো যে, দুদিন না খেয়েই থাকতে হলো সবাইকে। ওদিকে স্থানীয় ইন্ডিয়ানরাও অস্বীকার করে বসলো খাবার পাঠাতে। নাবিকরা ভাবলো, এবার সম্ভবত না খেয়েই মরতে হবে তাদের।

১৫০৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। বিকেলে ডেকে বসে পঞ্জিকা পড়ছিলেন কলাম্বাস। হঠাৎ দেখতে পেলেন সেদিন রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে।

এ খবরটি পড়ার সাথে সাথে এক অদ্ভুত বুদ্ধি এসে গেলো কলাম্বাসের মাথায়। তিনি জানতেন, চাঁদ-সূর্য নিয়ে হাজারো রকম অন্ধ বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে ইন্ডিয়ানদের মাঝে। তাকেই কাজে লাগাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

কলাম্বাস তখন জাহাজে ডেকে আনালেন ইন্ডিয়ানদের সরদারকে। তাকে বললেন, আমাদের খাবার নেই। না খেয়ে মরতে বসেছি সবাই। তোমরা যদি খাবার না দাও তবে আকাশ থেকে চাঁদ নামিয়ে ফেলবো আমরা। কোনো দিন চাঁদ উঠবে না আকাশে।

ইন্ডিয়ানদের সরদার কিন্তু কথাটা কানেই তুললো না। সে বললো, ওসব কথা বলে ভোলাতে পারবে না আমাদের। এক কণাও শস্য পাবে না তোমরা।

রাতে কিন্তু অবস্থা একদম বদলে গেলো। নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে যখন চাঁদের বরাবর এলো, তখন অন্ধকারে ডুবে গেলো চারদিক। ইন্ডিয়ানরা চেয়ে দেখলো ঠিকই চাঁদটা বিলিন হয়ে যাচ্ছে। তারা ঘাবড়ে গেলো এ দৃশ্য দেখে। কান্নার রোল উঠলো ঘরে ঘরে। আর সরদার নৌকো বেয়ে এসে হাজির হলো জাহাজে।

কলাম্বাস এ সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করলেন না। বললেন, বলেছি তো খাবার না পাঠালে চাঁদ কেড়ে নেবো আমরা। সে ক্ষমতা আমাদের আছে। তখন

এ চাঁদ আর উঠবেই না আকাশে। তবে খাবার পাঠালে সব ঠিক থাকবে। চাঁদ ফিরে পাবে তোমরা।

ইন্ডিয়ান সরদার আর কি করবে। মেনে নিলো সে এ প্রস্তাব। আর তার বিনিময়ে আবার জাহাজের ভাড়ারঘর ভরে উঠলো নানা রকম খাবারে। এরপর হিস্পানিওয়ালা থেকে আরো একটি জাহাজ সংগ্রহ করলেন কলাম্বাস। অত্যন্ত ছোট জাহাজ। তাতে চড়ে ১৫০৪ সালের ৭ নভেম্বর স্পেনে ফিরে এলেন তিনি।

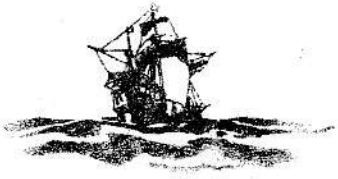

শেষ দিনগুলো

স্পেনে ফিরে আসার পর কলাম্বাস দেখতে পেলেন আমূল বদলে গেছে সবকিছু। এরই মধ্যে মারা গেছেন তাঁর অকৃত্রিম হিতৈষী রানী ইসাবেলা। তাঁরও বয়স হয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। হাত-পায়ে আর আগের মতো শক্তি পান না। কোনো কোনো দিন বিছানা ছেড়ে উঠতেও কষ্ট হয়। আলসেমি লাগে। আর সবচে দুঃখের ব্যাপার, রানীর মৃত্যুর পর রাজারও আর আকর্ষণ রইলো না কলাম্বাসের ওপর। বৃদ্ধ এ্যাডমিরাল অব দ্য ওসেন সি ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের আত্মীয়স্বজন ছাড়া তেমন খোঁজ-খবরও নেয় না কেউ!

এ অবহেলা একেবারে মর্মে আঘাত করলো কলাম্বাসের। মন স্বাস্থ্য শরীর সব নিস্তেজ হয়ে এলো দ্রুত। এর মাঝে রাজা অভিযোগ তুললেন–কলাম্বাস তাঁকে ঠকিয়েছেন। প্রাপ্য সোনা দেননি তিনি রাজাকে।

এসব ছিলো নিছক ভুল ধারণা। আসলে তেমন ধন সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি কলাম্বাসের পক্ষে। কিন্তু কে বিশ্বেস করবে তাঁর কথা? বিশেষ করে রানী ইসাবেলা নেই। তিনি থাকলে এভাবে অপমানিত হতে হতো না কলাম্বাসকে।

রাজার আচরণ আর শত্রুদের প্ররোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে আবার সমুদ্রে পাড়ি জমালেন কলাম্বাস। কিন্তু শরীর তাঁর তখন একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলো। তাই আমেরিকার ভান্নডোনিকায় এসে জাহাজ ছেড়ে দিলেন তিনি। অবশেষে এখানেই ১৫০৬ সালের ১১ মে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন সর্বকালের সেরা নাবিক ক্রিস্টোফার কলাম্বাস।

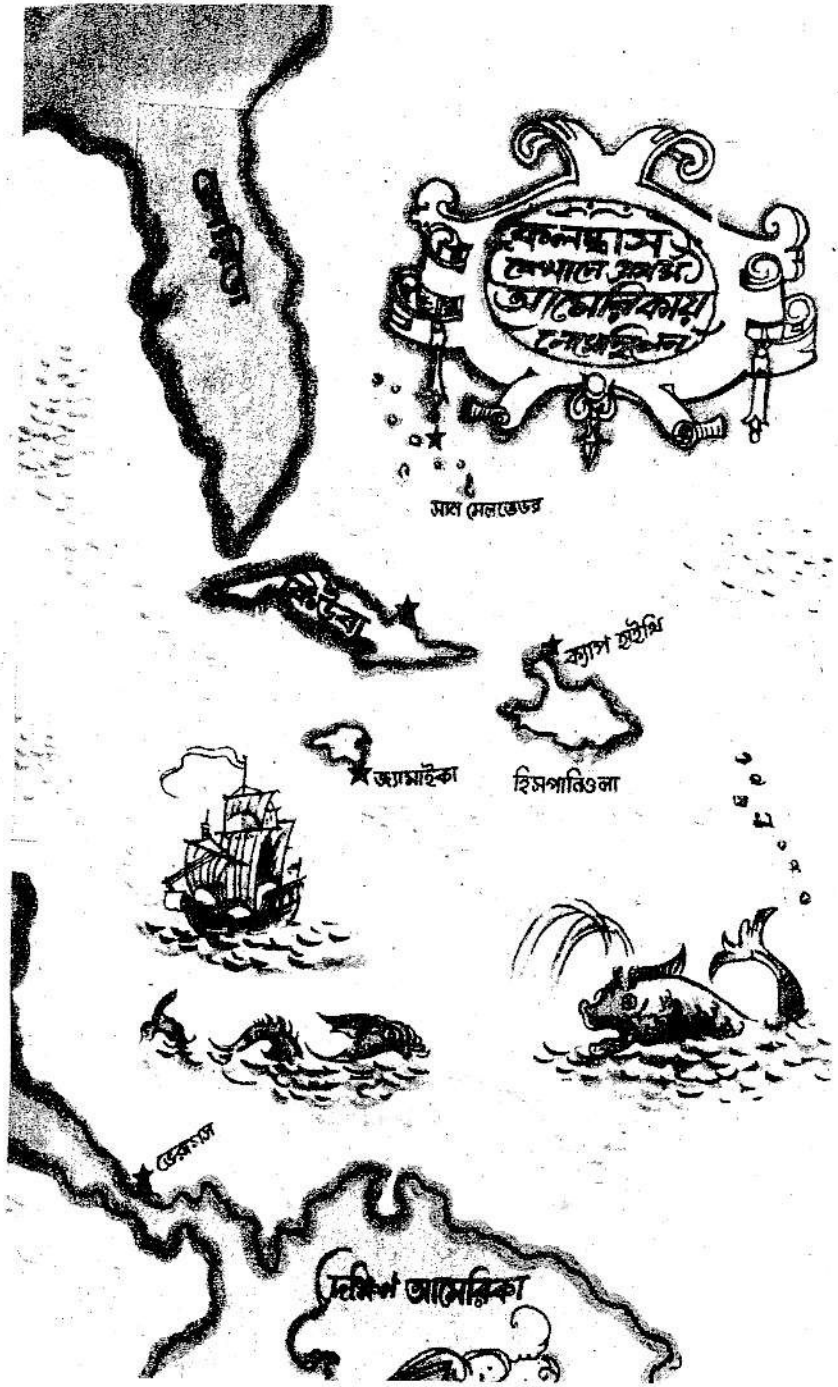
কলম্বাস
যেখানে প্রথম
আমেরিকায়
নেমেছিলেন
সাগ মেলভেডর
ক্যাপ হাইতি
জ্যামাইকা
হিসপানিওলা
ডেরিয়ন
দক্ষিণ আমেরিকা

কলাম্বাসের এসব আবিষ্কার যে কতো মূল্যবান ছিলো, তা বুঝতে পারেনি সে সময়কার মানুষ। সম্ভবত কলাম্বাস নিজেও বুঝতে পারেননি তা। কিন্তু এ কথা সত্যি, কোটি কোটি মানুষের জন্যে কলাম্বাস দিয়ে গেছেন এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান। যা মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে সমৃদ্ধির পথে। মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে বহু দূর। তাই আজও সচেতন মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে সর্বত্যাগী দুঃসাহসী এ নাবিক-কে।

গণগ্রন্থাগার উন্নয়ন কমিটি
অন্তর্ভুক্ত নং
১৫ ডিসেম্বর

ইউরোপ থেকে পশ্চিমমুখী রওনা হয়ে প্রাচ্যে পৌঁছার একটি পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে গিয়ে, অনেকটা ভুলক্রমেই যেন আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন কলাম্বাস, এবং ফলে তিনি যা ভাবতেও পারেনিন বিশ্ব ইতিহাসের ওপর তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব রেখে গিয়েছেন তিনি। নতুন দেশ আবিষ্কার অভিযানের ও নয়া বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের সূচনাকারী তাঁর এই আবিষ্কার এক বিশেষ ক্রান্তিকালে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো।

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়